কর্মচারী স্বার্থে ঃ স্বাস্থ্য প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডেপুটেশন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে রাজ্য সরকারী কর্মচারী, পেনশনার্স এবং ফ্যামিলি পেনশনার্সদের স্বাস্থ্য প্রকল্প সংক্রান্ত ১৪টি দাবিতে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন ও জমায়েত কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৩রা ডিসেম্বর '২৫ (বুধবার) দুপুর ১.৩০ থেকে খাদ্য ভবনে। খাদ্য ভবনে অর্থ (মেডিকেল সেল) বিভাগের যুগ্ম সচিবের কাছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ

সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল (সহ সম্পাদক প্রণব কর, দপ্তর সম্পাদক প্রশান্ত চন্দ্র, সহ-সভাপতি নিবেদিতা দাশগুপ্ত ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উৎসর্গ মিত্র) ১৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে কর্মচারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় খাদ্য ভবনে। উক্ত সমাবেশ পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। সভার শুরুতেই তিনি আজকের এই কর্মসূচীর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উত্থাপন করেন। এরপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, প্রায় ১ বছর আগে অনুরূপ কর্মসূচীতে আমরা এখানে জমায়েত করেছিলাম। স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশাকে চিহ্নিত করে তা নিরসনের জন্য স্বাস্থ্য সচিব সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের একাধিক চিঠি দিয়েছি। স্বাস্থ্য দপ্তরের অভ্যন্তরে নানা ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের সাথে প্রশাসন যুক্ত হয়ে পড়ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত অসংখ্য কর্মচারী বিশেষত নার্সিং স্টাফরা হেনস্তার শিকার হচ্ছে। আমরা একাধিকবার এই বিষয়গুলি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচনা করতে চেয়েছি। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময় চালু হওয়া ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীম ২০০৮-কে ক্যাশ পরিষেবা নাম দিয়ে ২০১৪ সালে আমাদের সামনে হাজির করা হয়। কিন্তু গুণগত কোনো পরিবর্তন আমরা লক্ষ করিনি। এখন নানা কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে পশ্চিমবাংলার মানুষ রয়েছেন। SIR-এ নাম থাকবে কি থাকবে না এই চিন্তায় চিন্তিত গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষ। এদিকে ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে মানুষ। সরকারী কর্মচারী হিসাবে যাঁরা SIR প্রক্রিয়ায় BLO হিসাবে ভূমিকা প্রতিপালন করছেন তাঁরাও প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছেন। শাসকদলের নেতা-কর্মীরা লাগাতার হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করছে BLO-দের উপর। কিন্তু সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমাদের সেই দায়বদ্ধতা আছে, তাই সন্ত্রাস ও হুমকিকে উপেক্ষা করে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রশাসনিক নিরাপত্তার ঘাটতি প্রতি মুহূর্তে আমরা অনুভব করছি। বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে আমাদের লড়াই জারি আছে। কর্মরত সহ অবসরপ্রাপ্ত সকলেই আমরা এই যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্য নিয়মিত মহার্ঘভাতা দিলেও ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ বহুদিন আমাদের কাছে অধরা ছিল। অনেক লড়াই আন্দোলনের পর তার কিছুটা অংশ সরকার প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী কর্মচারী সহ পেনশনার্স এবং ফ্যামিলি পেনশনার্সদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবা রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারীরা এই পরিষেবা গ্রহণ করতে গিয়ে নানা সমস্যার মধ্যে পড়ছেন। বিশেষ করে পেনশনার এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের এই সমস্যা আরো তীব্র আকার ধারণ করছে। WBHS-এ ভর্তি নেওয়ার ক্ষেত্রে নার্সিং হোমগুলির অনীহা আজ এর অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সার্জারি সংক্রান্ত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকরা বাড়তি অর্থ দাবি করছেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত রেট চার্ট বহুদিন আপডেট করা হয়নি। চিকিৎসার পর দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও নানা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। অথচ বছরে ৬০০০ টাকা আমরা প্রদান করছি। সরকার বিনামূল্যে আমাদের এই পরিষেবা প্রদান করছে না। তাই এই লড়াই আমাদের চলবে। এক বছর আগে এসেছিলাম, আজ এসেছি, আবারও আসব। এরপর ১৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তিনি সমাবেশে পাঠ করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এরপর এই ১৪ দফা দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি সমাবেশে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান। এছাড়াও যাঁরা উপস্থিত হতে পারেননি, কিন্তু এই বহুতল অফিসের বিভিন্ন জানলা, বারান্দা থেকে মুখ বার করে বক্তব্য শুনছেন তাঁদেরও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কর্মচারীর স্বার্থের সাথে কোনোদিন আপোস করেনি, আজও করবে না। তাই আজ আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এক বছর আগেও এই একই জায়গায় আমরা WBHS-এর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সভা করে স্মারকলিপি প্রদান করেছিলাম। কিছু সমস্যার সমাধান হলেও অধিকাংশ দাবি অনার্জিত থেকে গেছে। সেইদিন আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে এসেছিলাম দাবির সুষ্ঠু সমাধান না হলে আমরা আবার আসব। তাই রাজ্য কাউন্সিল সভায় এই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছিলাম। তাই পূর্বেই চিঠি দিয়ে আজ যুগ্মসচিবের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের জন্য সময় চাওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা তা অনুমোদন করেছেন। আমরা আজ এই ১৪ দফা দাবি নিয়ে তাঁদের সাথে পুনরায় আলোচনায় বসব। কেন্দ্রীয়

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

স্বাস্থ দপ্তরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডেপুটেশন কর্মসূচী

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা, গরিব প্রান্তিক মানুষের কাছে সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ব্যর্থতা, দুর্নীতি রোধে রাজ্য প্রশাসনের অক্ষমতা, রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলি থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যন্ত সর্বত্র বিপুল শূন্যপদের কারণে চিকিৎসক, নার্স সহ সব ধরনের কর্মী অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্য খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না করে পরোক্ষে বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে গত ১০ ডিসেম্বর লবণ হ্রদের স্বাস্থ্য ভবনে দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ২৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করে ডেপুটেশন দিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ডেপুটেশন ও আলোচনায় সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত

চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়, সহ-সম্পাদক প্রণব কর ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গীতা দে।

স্মারকলিপিতে সরকারী স্বাস্থ্য কাঠামোর হাল ফেরানো, রাজ্যের গরিব মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুপার স্পেশালিটি, বাহ্যিক চাকচিক্যপূর্ণ বাগাড়ম্বর বন্ধ করে প্রকৃত পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রশাসনিক নজরদারির জন্য নির্দিষ্ট দাবি উত্থাপনের পাশাপাশি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে জড়িত টেকনিক্যাল, নন-টেকনিক্যাল, করণিক, অস্থায়ী ও আশা কর্মীদের ভাতা, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহুবিধ বেনিয়ম বন্ধ করে সমস্ত ধরনের প্রাপ্য প্রদানে স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণের দাবি জানানো হয়েছে। আলোচনার সময়ে স্বাস্থ্য অধিকর্তা দাবিগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করে সহমত পোষণ করেছেন বলে নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন উপলক্ষে

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

মহিলা ক্রিকেটে ভারতের বিশ্বজয়

আরব সাগর পারে নতুন রূপকথা

২ নভেম্বর, ২০২৫। নবি মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়াম। শুধুমাত্র একটি ফাইনালে জয় নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের বহু যুগের এক অপেক্ষার অবসান। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল জিতল তাদের প্রথম বিশ্বকাপ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে

পরাজিত করে ইতিহাস লিখল 'Women In Blue'। এই জয় শুধু একটা ট্রফি জয় নয়, এ ছিল 'মেয়েদের ক্রিকেট' নামক উপহাসের থেকে 'ক্রিকেট' নামক মূল স্রোতে ফিরে আসার পথে এক মাইলফলক। দীর্ঘ পাঁচ দশকের অপেক্ষা, এর আগে দু'বার ফাইনালের দোরগোড়া থেকে ফিরে আসার বেদনা সব মুছে গিয়ে আরব সাগরের পারে রচনা হল নতুন ইতিহাস। ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের মাথায় এবার বিশ্বজয়ের মুকুট।

প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেট হারিয়ে ভারত তোলে ২৯৮ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২৪৬ রানে আটকে গেল প্রোটিয়াসদের ইনিংস। ৫২ রানে জিতে অধরা মাধুরীর স্বাদ পেল ভারতের মেয়েরা। ব্যাটে বলে স্মরণীয় ইনিংস উপহার দিলেন শেফালি ভার্মা ও দীপ্তি শর্মা। বাংলার মেয়ে রিচার ঝোড়ো ব্যাটে এল ২৪ বলে ৩৪ রানের দাপুটে ইনিংস। মারলেন ৩টি চার ও ২টি ছয়। আমাদের রাজ্যের শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ বিশ্বকাপ জয়ী প্রথম বাঙালি ক্রিকেটার হিসেবে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছেন।

প্রায় ৩০০ রান তাড়া করতে নেমে লরা উলভার্টের লড়াকু শতরান সত্ত্বেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি সাউথ আফ্রিকা। দীপ্তি, শেফালির অনবদ্য বোলিং-এ ২৪৬ রানেই আটকে যায় প্রোটিয়াসদের ইনিংস।

একটা সময় যে মহিলা ক্রিকেটকে সরকারের ক্রীড়া দপ্তর বলুন কিংবা ক্রিকেট বোর্ড, কোনও মহল থেকেই তেমন পাত্তা দেওয়া হতো না। আজ সেই ধারণা বদলে গিয়েছে। ফাইনালেও দেখা গিয়েছে গোটা স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শক। টিভির পর্দায় একবারও মনে হয়নি যে এটা আই সি সি বিশ্বকাপ (পুরুষ) থেকে কম কিছু। জয় শাহের হাত থেকে যখন ট্রফি নিচ্ছিলেন হরমনপ্রীত, তারপর তাদের উচ্ছ্বাস যেন দেখিয়ে দিচ্ছিল বার বার যে, 'আজ কোনো অর্থেক আকাশ নয়, গোটা বিশ্ব আমাদের'। আমাদের দেশে এখনও মহিলা ক্রিকেটের উন্নতির জন্য কোনো ভালো অ্যাকাডেমি নেই, নেই ভালো কোচিং-এর সুবিধা। সরকারী ইচ্ছার কথা বাদই দিলাম। কিন্তু এই সবের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা মেয়েরা ক্রিকেটের বিশ্বমঞ্চের যে লড়াই দেখালো তা কুর্নিশ কুড়িয়েছে গোটা বিশ্বের।

হরমনপ্রীত, শেফালি, দীপ্তি, রিচাদের পাশাপাশি আরেকজনের নামও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ভারতীয় দলের কোচ অমল মজুমদার। মুম্বাইয়ের হয়ে একসময় ঘরোয়া ক্রিকেটে দাপটের সাথে খেললেও সুযোগ পাননি ভারতের হয়ে টেস্ট খেলার। আজ হরমনপ্রীতদের হাত ধরে নিজের না ছুঁতে পারা স্বপ্নকেই হয়তো কিছুটা হলেও ছুঁয়ে দেখলেন।

আজ দেশের শাসক হোক কিংবা ক্রিকেট প্রশাসক, সকলেই এই বিশ্বজয়ের কৃতিত্বের ভাগ নিতে তৎপর। একথা হয়তো ঠিক যে পুরুষ এবং মহিলা, উভয় দলের সদস্যদের ম্যাচ ফি এখন সমান; পুরুষদের মতো মহিলা ক্রিকেটেও গ্রেডেশন সিস্টেম চালু আছে। কিন্তু পুরুষ দলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপরে থাকা এ-প্লাস গ্রেডে থাকা খেলোয়াড় যখন ৭ কোটি বেতন পান, নীচের সি-গ্রেডে থাকা খেলোয়াড় ১ কোটি টাকা পান, সেখানে মহিলা দলের সবচেয়ে উপরে এ-গ্রেডে থাকা খেলোয়াড় পান মাত্র ৫০ লাখ। ইডেন গার্ডেন, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের মতো বড়ো বড়ো স্টেডিয়াম মহিলা ক্রিকেটের ভেন্যু লিস্টে স্থান পায় না সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো লিঙ্গবৈষম্য-এর শিকার এদেশের মহিলা ক্রিকেটও।

যে রাজ্যের বুকে দাঁড়িয়ে তৈরী হল ভারতীয় ক্রিকেটের এই নতুন ইতিহাস, সেই রাজ্যের নাগপুরেই আর এস এস-এর সদর দপ্তর। সেই আরএসএস যারা মনুবাদে বিশ্বাসী। মনুবাদে বিশ্বাসী মানুষ মনে করেন মহিলাদের জন্ম শুধুমাত্র ঘরের কাজ করার জন্য। রান্না ঘরেই তারা আবদ্ধ থাকবে। এই সব ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে হরমনপ্রীত কৌর, রিচা ঘোষরা। এই ভারতীয় দল যখন মাঠে নেমেছিল, তখন তাদের গায়ে শুধু দেশের জার্সি নয়, ছিল সমাজের অদৃশ্য অথচ কঠিন এক প্রত্যাশার বোঝা। পুরুষদের সাথে সর্বদা তাদের তুলনা করা হয়। খেলার সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই সেই পুরানো পিতৃতান্ত্রিক স্বর শোনা যায়, 'মেয়েদের খেলাটা আসলে একটা ঐচ্ছিক বিনোদন মাত্র'। এই জয় শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানো নয়, বরং সেই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতি নীরব প্রতিবাদ।

রাতের বেলায় মহিলারা কোনো কাজ করতে পারবে না এমন নিদান এখনও এই দেশে চলে। আমাদের রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীও এই মনোভাব পোষণ করেন। এ দেশে আজও ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য, ধর্মাচরণের জন্য জেমাইমা রড্রিগেজকে উইকেট পড়ার পরে যখন উল্লাস শুরু হল, ভারতীয় দলের সদস্যদের আনন্দের অশ্রু শুধুমাত্র জয়ের আবেগ ছিল না, ছিল যুগে যুগে নিগৃহীত স্বপ্নগুলোর মুক্তি। এ ছিল সেইসব নারীর জন্য 'স্বাধীনতার বার্তা', যারা আজও খেলাধুলা বা কর্মজীবনে পা বাড়াতে ভয় পান। নীল জার্সির উল্লাস যেন দেশের ১৪০ কোটি মানুষের সামনে এক সোচ্চার ঘোষণা—হ্যাঁ আমরাও পারি, সব মেয়েরাই পারে। তাদের প্রতিটা রান, প্রতিটা উইকেট ছিল যেন 'সমানাধিকারের সপক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ'। যে রবিবার রাতে ভারতের সোনার মেয়েরা দেশকে এমন সোনার জয় উপহার দিলেন, সেই রবিবার সকালেই দেশের এক জেলা ঝাড়গ্রামে শিশুকন্যাকে বিষ খাওয়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ঠাকুমাকে। পাঞ্জাব কিংবা হরিয়ানা, যেখানে সবচেয়ে বেশি কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয়, সেখানকার মেয়ে হরমনপ্রীত, শেফালি ভার্মা, প্রতিকা রাওয়ালের মায়েরা টিভি পর্দায় নিজের মেয়েদের বিশ্বজয় করতে দেখে জলভরা চোখে ভাবছিলেন আমাদের এই গর্ভে ধারণ করা মেয়েরাই আমাদের গর্ব। ছেলে সেজে মাঠে অনুশীলন করতে যেতে হতো শেফালিকে। এই জয় ছিল ভীনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিকদের হয়ে ব্রিজভূষণ শরণ সিংদের গালে সজোরে এক থাপ্পড়।

এই বিশ্বকাপ জয় দেশের কোটি কোটি মেয়েকে এক নতুন দিশা দিয়েছে। এই জয় শিখিয়েছে যে পথ কঠিন হতে পারে, সমালোচনা তীব্র হতে পারে, কিন্তু যদি ইচ্ছাশক্তি ইস্পাত কঠিন হয়, তবে এই সমাজকে নিজেদের নিয়মে চলতে বাধ্য করা যায়। আমাদের দেশের মেয়েরা শুধু ক্রিকেটের বিশ্বকাপই জেতেনি, তারা দেশের নারী সমাজের জন্য সমতার লক্ষ্যে লড়াইয়ে নবজোয়ার এনে দিয়েছে। □

সংগ্রামী হাতিয়ার
অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
তেপান্নতম বর্ষ □ ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা □ মূল্য ঃ ৪ টাকা

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের চাকা উল্টো ঘোরানোর প্রচেষ্টার একশো বছর

যে কোনো সংগঠন, তা সে যে মতাদর্শেরই হোক তার শতবর্ষপূর্তি নিশ্চিতভাবেই একটি আলোচনার বিষয়। শুধু সংগঠনই নয়, কোনো বিশেষ দিন বা বিশেষ কোনো ব্যক্তির জন্ম অথবা মৃত্যুদিনেরও রজতজয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী, হীরক জয়ন্তী বা শতবর্ষপূর্তি পালন করা হয়। একটাই উদ্দেশ্য, সেই দিনটি যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে বিবেচ্য হয় অথবা সেই ব্যক্তি সমাজের জন্য যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে গেছেন অথবা যা কিছু সৃষ্টি করে গেছেন, সেগুলি আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সেই দিনটি স্মরণ করা। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দার্শনিক কার্ল মার্কস সহ মনীষীদের জন্মদিনগুলিতে যেমন তাঁদের সৃষ্টি ও অবদান নিয়ে আলোচনা আমরা করি, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব ইত্যাদি দিনগুলিকেও আমরা উদ্‌যাপন করি তার ইতিহাসের তাৎপর্যকে পর্যালোচনা করার মধ্য দিয়ে। আবার ১৯৪৫ সালে ৬ আগস্ট ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার পরমাণু বোমা ফেলার কুৎসিততম ঘটনার দিনগুলিও আমরা তার নেতিবাচক তাৎপর্য, ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করি। কাজেই যে কোনো ধরনের বিশেষ দিন বা বৎসরকে আমরা দুইভাবে আলোচনাতে নিয়ে আসি। একটি ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক। অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হিটলার এই দু'জনের জন্ম অথবা মৃত্যুদিন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে আলোচনা করব নিশ্চয়।

১৯২৫ সালে ভারতের বুকে জন্ম নেওয়া দুই মনীষী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ আমরা পালন করছি। আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য অকালে চলে যাওয়া এক অসামান্য প্রতিভাধর কবি সুকান্তর সৃষ্টিশীলতা ও তাঁর বৈপ্লবিক সৃজনশীলতা এবং ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে সমাজকে যে প্রগতির বার্তা দিয়ে গেছেন সেগুলি। একই সাথে এই বছরে ভারতের বুকে জন্ম নেওয়া একটি দক্ষিণপন্থী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর এস এস-এরও শতবর্ষ।১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠনের শতবর্ষ সংঘ পরিবার তাদের মতো করে ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে উদ্‌যাপন করার চেষ্টা করছে। তেমনি ইতিহাসবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, প্রগতিশীল ভাবধারায় বিশ্বাসী মানুষ এই সংগঠনের প্রকৃত চেহারা, ইতিহাস যার সঙ্গী, তা নিয়ে আলোচনা করছে। ইতিহাস বড় নির্মম, সত্যকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। তবে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে যে ইতিহাস বর্তমানে রচিত হয়েছে বা এখনও রচনা করার চেষ্টা চলছে সেটাকে বিকৃত ইতিহাস বলে। আমরা প্রকৃত ইতিহাস তাকেই বলি, বাস্তব ঘটনা বা প্রকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে যে ইতিহাস রচিত হয়। আর এস এস-এর হিন্দুত্ববাদের তাত্ত্বিক প্রবক্তা সাভারকর ব্রিটিশ আমলে আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন এটা ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু আন্দামানের সেলুলার জেলে থেকেও ব্রিটিশদের সাথে কোনো আপোস করেননি সাভারকর এবং সেলুলার জেলের বন্দীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ সফল ছিলেন এই ধরনের বক্তব্য হল ইতিহাসের তথ্য বিকৃতি। আর এস এস বা তাদের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি যেটা করার চেষ্টা করছে। প্রকৃত ইতিহাস হল বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাভারকর ৬ দফায় ১৩টি মুচলেখা পত্র ব্রিটিশ শাসকদের পাঠিয়েছিলেন। যেখানে মুক্তি পেলে ব্রিটিশদের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি ছিল।

একশত বছরের ইতিহাসে আর এস এস তিনবার নিষিদ্ধ হয়েছে, ১৯৪৮, ১৯৭৫ ও ১৯৯২ সালে। গান্ধী হত্যার রক্তের দাগ লেগে আছে এই সংগঠনের শরীরে। ১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ধ্বংস আর এস এস ও সংঘ পরিবারের অন্যতম জঘন্য কীর্তি। যার দরুন আন্তর্জাতিক মহলে দেশের মাথা হেঁট হয়েছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে বারুদ হিসাবে ব্যবহার করে গোটা ভারতে দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়েছিল সংঘ পরিবার ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। এছাড়াও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্তত ৫টি বড় ঘটনা নিয়ে আর এস এস-এর বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন করতে হয়েছিল। সেগুলি হল—১৯৬৯-এর আমেদাবাদ দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে গঠিত জগনমোহন রেড্ডি কমিটি, ১৯৭০-এর ভিওয়ান্ডি দাঙ্গা নিয়ে গঠিত ডি পি মদন কমিটি, ১৯৭১-এর থালাসেরি দাঙ্গা নিয়ে গঠিত বি যোসেফ কমিটি, ১৯৭৯-এর জামশেদপুর দাঙ্গা নিয়ে গঠিত জীতেন্দ্র নারায়ণ রিপোর্ট এবং ১৯৮২-এর কন্যাকুমারী দাঙ্গা নিয়ে গঠিত পি বেনুগোপাল কমিটি। প্রতিটি কমিটিই তাদের রিপোর্টে আর এস এস-এর ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০২-এর গুজরাট দাঙ্গার নৃশংসতা আজও আমাদের স্মৃতিতে সজীব রয়েছে। কতটা পৈশাচিক ভাবে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয়েছিল তা গোটা পৃথিবী দেখেছে।

১৯৫৪ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু হিন্দুত্ববাদীদের সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে বলেছিলেন, ''আর কেউ নয়, ভারতে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো দক্ষিণপন্থী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ''। ১৯৩২ সালের রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ডোনাল্ড ইউনিস স্মিথ তাঁর 'India as a secular State' বইতে লিখেছেন যে আর এস এস-এর সাথে ফ্যাসিস্তদের সাদৃশ্যের দিকগুলি হল—সামরিক শৃঙ্খলা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, উচ্চবর্ণের সংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের উপর জোর দেওয়া, অতীতের প্রতি আচ্ছন্নতা এবং সংখ্যালঘুদের বর্জন করা। আর এস এস-এর শতবর্ষের ইতিহাস উপরোক্ত বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আর এস এস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা বিন্টো মুসোলিনী শাসিত ইতালিতে গেছিলেন ফ্যাসিবাদ থেকে প্রেরণা নিতে এবং ফ্যাসিবাদের প্রয়োগ হাতেকলমে শিখতে। আর এস এস নেতা এবং প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী এই ধরনের ফ্যাসিবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে ১৯৯১ সালে বলেছিলেন, ''মুসলিম ও খ্রিস্টানরা কেউই তাদের নিজস্ব পরিচিতিসত্তা দিয়ে গ্রহণযোগ্য হবেন না। তাদের হিন্দুত্বকরণ (Hinduised) করতে হবে।''

বর্তমানে ১২ বছর ধরে রাষ্ট্রক্ষমতায় বিজেপি। ক্যাবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলিতে আর এস এস-এর লোকেদের বসানো হয়েছে। আর এস এস এমন একটা সংগঠন যাদের বরাবর প্রকাশ্য কর্মসূচীর পাশাপাশি একাধিক গোপন কর্মসূচী আছে। যে কর্মসূচীর সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বা তারও আগে মর্মবস্তু থেকে প্রকৃত ''ভারত ধারণা''-র (Idea of India) নির্মাণ হতে থাকা বিপরীত ধর্মী। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ভারত ধারণার মৌলিক যে বৈশিষ্ট্য এটা তারা মানে না। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র—দেশের সংবিধানের এই মর্মবস্তুকে তারা অমান্য করে। সংবিধানের ৫১এ(এইচ) ধারা বলে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য হল বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলা। আর এস এস একে অস্বীকার করে এবং যুক্তির বিনাশ ঘটাতে চায়। সেই অনুযায়ী বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা, ইতিহাস গবেষণা এবং ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চায়। ১৯৫৭ সালে আর এস এস-এর মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এ তাদের তৎকালীন রাজনৈতিক শাখা জনসংঘ-র সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রস্তাব ছাপা হয়। সেখানে বলা হয় 'শিক্ষার ভিত্তি হবে জাতীয় সংস্কৃতি'। ভারতের ইতিহাসের পুনর্লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়। আর এস এস-এর এই গোপন এজেন্ডাগুলিকে কার্যকর করতে চাইছে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

অবাক করার মতো বিষয় হল ১০০ বছর পেরোনো আর এস এস কোনো নিবন্ধীকৃত সংগঠন নয়। অর্থাৎ এই সংগঠনের কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই। কেন নেই এই প্রশ্নে আর এস এস-এর বক্তব্য যে তারা হল "A body of Private Individuals", তাই তাদের নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন নেই। রেজিস্ট্রেশনহীন একটি সংগঠনের এত অর্থ, সম্পত্তির উৎস কী—স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন উঠছে। নাগপুরে আর এস এস-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর ও অন্যান্য সম্পত্তি আছে। সম্প্রতি নতুন দিল্লীতে তাদের দপ্তর 'কেশব কুঞ্জ'কে নবকলেবরে সাজিয়েছে। ৫ লক্ষ বর্গফুটের উপর তিনটি ১২তল বিশিষ্ট ভবন রয়েছে যা নির্মাণে ১৬০ কোটি টাকার বেশি খরচ করা হয়েছে। এর ভিতরে রয়েছে ৪ একর জমিতে ১৫০ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র, ১৪০ কিলোলিটার পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার, অন্তত ২০০ গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা এবং অবশ্যই একটি মন্দির। এত অর্থ কোথা থেকে আসছে এই প্রশ্ন তো উঠবেই।

আর এস এস নিজেদের সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে দাবি করে এবং ফলে তারা রাজনীতির সাথে যুক্ত নয়। এটা বর্তমানে আর গোপন নয় যে এই তথাকথিত সাংস্কৃতিক সংগঠন, তার রাজনৈতিক শাখা বিজেপি-র মাধ্যমে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিচালনা করে। অবশ্য এই ধ্রুব সত্যটি দেশবাসী বুঝে গেলেও, এ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত বোঝেননি। তাঁকে আর এস এস দুর্গা আখ্যা দিয়েছিল এবং তিনিও প্রতি জবাবে আর এস এস-কে দেশপ্রেমিক বলেছিলেন। বিগত ১৪ বছর ধরে তৃণমূলের শাসনে আর এস এস ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আর এস এস-এর সাম্প্রদায়িকতার সাথে শাসকদলের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধনে পুষ্ট হচ্ছে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয় মৌলবাদী শক্তি। এই রাজ্যে আর এস এস-কে নিয়ে আলোচনায় এই বিপদটাই কেন্দ্রীয় বিষয় হওয়া প্রয়োজন। এই রাজ্যের চিরাচরিত ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশকে বিনাশ করছে যারা, তাদের প্রকৃত রূপ জনসমক্ষে উন্মুক্ত করার দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে, ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘুরিয়ে মনুবাদী সমাজে অথবা পুরাণকালে নিতে চায় যারা তাদের জনবিচ্ছিন্ন করতেই হবে। □

২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কর্মচারী স্বার্থে ঃ স্বাস্থ্য প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডেপুটেশন

সরকার ৫৮০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বেসরকারী বিনিয়োগের পরিকাঠামো তৈরীর জন্য। সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সাধারণ মানুষ আজ বিচ্ছিন্ন। কেন্দ্রীয় সরকার বীমা ব্যবসায় বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়ার পর স্বাস্থ্য বীমার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। পাল্লা দিয়ে কমছে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকারী বিনিয়োগ। এইরকম পরিস্থিতিতে বিগত বামফ্রন্ট সরকার সরকারী কর্মচারী, পেনশনার্সদের জন্য চালু করেছিল ঐতিহাসিক স্বাস্থ্য প্রকল্প ২০০৮। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কাছে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল এই প্রকল্প। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রকল্পের নাম পরিবর্তন হলেও প্রকল্প পরিচালনায় অপেশাদারি মনোভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। রাজ্য সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেক বেসরকারী হাসপাতাল হেলথ স্কীমে রোগী ভর্তি করতে এবং চিকিৎসা পরিষেবা দিতে অস্বীকার করছে। বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগ বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা খরচের হার দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকার কারণেই মূলত বেসরকারী হাসপাতালগুলি পরিষেবা প্রদান করতে উৎসাহ বোধ করছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি বাড়তি অর্থ দাবি করা হচ্ছে। এই হয়রানি বন্ধ হওয়া দরকার। এই প্রকল্প পরিচালনার জন্য পেশাদারি দক্ষতা সম্পন্ন পরিচালন ব্যবস্থা দরকার। দরকার সারপ্রাইজ ভিজিট। যার মধ্য দিয়ে পরিষেবা প্রদান করতে অনিচ্ছুক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করে তাদেরকে পরিষেবা প্রদান করতে বাধ্য করা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি সহ বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আগামী ১০ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ভবন অভিযান হবে। ব্যাপক জমায়েতের মধ্যে দিয়ে প্রশাসনের অভ্যন্তরে কাঁপন ধরিয়ে দিতে হবে। অভয়ার ন্যায় বিচারকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। অভয়া মঞ্চের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতির কাছে দ্রুত ও স্বচ্ছ বিচারের আর্জি জানিয়ে তার স্বাক্ষর কর্মসূচীতে আমাদের শামিল হতে হবে। আজ এই সমাবেশে উপস্থিত সকলেই এই স্বাক্ষর কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলন আগামী ১০-১২ জানুয়ারি নদীয়া জেলার ঐতিহাসিক কৃষ্ণনগর শহরে অনুষ্ঠিত হবে। তার প্রচার কর্মসূচীর কাজ চলছে। রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে জেলা/অঞ্চলের সম্মেলনের কাজ চলছে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে এই সম্মেলন পর্ব এগিয়ে চলছে। আজকের এই ডেপুটেশন কর্মসূচীর বিষয় সম্মেলন পর্বে তুলে ধরতে হবে। ব্যাপক প্রচারের মধ্যে দিয়ে আজকের এই সমাবেশ এবং ডেপুটেশনের আলোচ্য বিষয় কর্মচারী বন্ধুদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ভবন অভিযানকে সফল করতে প্রতিটি কর্মচারী বন্ধুর কাছে পৌঁছোনোর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সাথী হিসেবে, শ্রমকোডের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। সকলকে পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। এর পর সভাপতি মানস দাস সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং জানান যে ডেপুটেশনে আলোচনার বিষয় খাদ্য দপ্তরের ১১ নং শেড-এর হল ঘরে জানানো হবে। সকলকে ১১ নং শেডের ঘরে গিয়ে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

ডেপুটেশন পরবর্তীতে সহ সম্পাদক প্রণব কর আলোচনার বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে সমস্ত দাবির সাথেই তাঁরা সহমত ব্যক্ত করেছেন এবং সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। □

সোমনাথ পোদ্দার

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি /১১১/২৫ **তারিখ ঃ ০৩/১২/২০২৫**

পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ০৩/১২/২০২৫ দুপুর ২.৩০ টায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বরা খাদ্য ভবনে অর্থ (মেডিকেল সেল) বিভাগে যুগ্ম-সচিবের সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত দাবিগুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন এবং যুগ্ম-সচিব আমাদের অধিকাংশ দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে তা দ্রুত রূপায়ণের জন্য সচেষ্ট হবেন বলে জানিয়েছেন।

দাবিসমূহ ঃ

১। অবিলম্বে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্তদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ক্যাশলেস করতে হবে।

২। চিকিৎসা ভাতা প্রতি মাসে ৩০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০ টাকা হলেও পরিষেবার গুণমান হ্রাস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্যানেলভুক্ত হাসপাতালে কর্মচারী / অবসরপ্রাপ্তদের জন্য নির্দিষ্ট আসন না থাকলে তার উপরের আসনে ভর্তির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। WBHS পোর্টালে বেসরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের খালি আসন সংখ্যার তথ্য প্রকাশ করতে হবে। প্যাকেজ বহির্ভূত কোনও অর্থ যেন কর্মচারী / অবসরপ্রাপ্তদের না দিতে হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। দ্রুত CARC ইস্যু করতে হবে।

৪। অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে অনলাইন ক্লেইম জমা দেবার ক্ষেত্রে PSA-এর অফিস যাতে দায়বদ্ধ থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫। রিজিওনাল ও ডাইরেকটরেট স্তরে চিকিৎসা বিল অনুমোদনের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৬। ডক্টরস ফিজ সহ রেট চার্ট আপডেট দিতে হবে।

৭। বহিরাগত রোগী বিভাগ-এর (OPD) ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস করতে হবে।

৮। IVF এবং এই সংক্রান্ত সমস্যা হেলথ স্কিমে বহিরাগত রোগী বিভাগ-এ (OPD) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯। Polycystic ovarian syndrome & Polycystic ovarian disease হেলথ স্কিমে বহিরাগত রোগী বিভাগ-এ (OPD) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০। Type 2 diabetes mellitus (T2DM) হেলথ স্কিমে বহিরাগত রোগী বিভাগ-এ (OPD) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১। Eye related disease-কে OPD treatment-এর আওতায় আনতে হবে।

১২। মেডিকেল বিল re-imbursement করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করতে হবে।

১৩। Allotment না থাকলেও মেডিকেল বিল পাস করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো টালবাহানা চলবে না।

১৪। চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদেরকে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে,

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

নভেম্বর বিপ্লব এবং সমসাময়িক বিশ্ব ব্যবস্থা

প্রণব কর

২০২৫-এর ৭ নভেম্বর, নভেম্বর বিপ্লবের ১০৮তম বার্ষিকী পালন করছি আমরা। নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া (প্যারি কমিউনের ৭২ দিনের ভ্রূণ শ্রমিক রাষ্ট্রকে আলোচনায় না রেখে)। সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীকে দেখিয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের সৃষ্টিমূলক ক্ষমতা। পশ্চাৎপদ একটি দেশ কীভাবে দ্রুত পৃথিবীর উন্নততম ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল তা দেখিয়েছিল পৃথিবীকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ২ কোটি প্রাণের বিনিময়ে পরাস্ত করেছিল মানবতার শত্রু ফ্যাসিস্ট শক্তিকে। ক্রীড়াক্ষেত্রে একের পর এক অলিম্পিকে ধারাবাহিকভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন। মহাকাশ বিজ্ঞানে একের পর এক সাফল্যের পালক জুড়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। পাশাপাশি ছিল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান। নভেম্বর বিপ্লব দেখিয়েছিল পুঁজিবাদের থেকে সমাজতন্ত্র এক উন্নততর ব্যবস্থা। সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের কাছে আলোকবর্তিকা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

প্রায়োগিক ত্রুটির জন্য ১৯৯১ সালে পতন হয়েছে সোভিয়েত ব্যবস্থার। যে সময়ে নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল তখনকার আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বর্তমান সময়ের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। সোভিয়েতের পতনের পরে অনেক বুর্জোয়া তাত্ত্বিক ঘোষণা করেছিলেন—"The End of History" বলে। কিন্তু ইতিহাস বড়ই নির্মম। বিগত তিন দশকের বেশি সময়কাল প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝিয়েছে কেন সমাজতন্ত্রই বিকল্প।

লেনিনের নেতৃত্বে যে সময়ে নভেম্বর বিপ্লব সম্পন্ন হচ্ছে, সে সময়ে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিতে পরিণত হয়েছে। ব্যাঙ্ক পুঁজি আর শিল্প পুঁজি একত্রিত হয়ে তৈরী হয়েছে লগ্নীপুঁজি। এই একচেটিয়া পুঁজিবাদী স্তরকেই লেনিন বলেছেন সাম্রাজ্যবাদ।

লেনিনের সময় লগ্নীপুঁজি ছিল জাতিরাষ্ট্রের অধীনে। দেশীয় লগ্নীপুঁজির স্বার্থে জাতি-রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশগুলির উপর দখল বজায় রাখতে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে পুঁজিবাদী শৃঙ্খলের মধ্যে দুর্বলতম গ্রন্থিতে আঘাত করে লেনিন নভেম্বর বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলেন।

কিন্তু বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আজ লগ্নীপুঁজি আর জাতি-রাষ্ট্রের অধীনে নেই, লগ্নীপুঁজি আজ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহণ করেছে। সারা বিশ্বজুড়ে তার অবাধ চলাচল। পূর্বতন জাতি-রাষ্ট্রগুলি পুঁজিকে তার চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখতে যে সব নিয়মকানুন তৈরী করেছিল, তা সম্পূর্ণ তুলে দিতে বাধ্য করেছে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি। চরিত্রে আন্তর্জাতিক হওয়ায় লগ্নীপুঁজি বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জাতি-রাষ্ট্রগুলিকে বর্তমান বিশ্বে নিয়ন্ত্রণ করছে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি। লগ্নীপুঁজির স্বার্থে তাকে বদলে ফেলতে হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নিয়মাবলী। না হলে এই পুঁজি দ্রুততার সঙ্গে এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

তাই বিশ্বের যে কোনো দেশেই যে চরিত্রের সরকারই থাকুক না কেন, তাদের সবাইকেই আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির নির্দেশ মেনেই কাজ করতে হবে। ফলে একটি রাষ্ট্রের মানুষ তার দেশের যে কোনো রাজনৈতিক দলকেই ক্ষমতায় নিয়ে আসুক না কেন, সব দলকেই কম বেশি একই ব্যবস্থায় কাজ করতে হবে। এর ফলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে এক ধরনের একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে প্রায় সব রাষ্ট্রগুলিতেই।

কিন্তু আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির দাপটে একটি রাষ্ট্রের শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ধ্বংস হচ্ছে না, তার অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের ক্ষমতাও প্রায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

বর্তমানে পুঁজিবাদ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে তার পোশাকি নাম নব্য-উদার অর্থনীতি। এই ব্যবস্থায় সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে কোনো ভূমিকা থাকবে না, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে বাজার। পুঁজিবাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পুঁজির কেন্দ্রীভবন। ফলে এই ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে মন্দার কবলে পড়ে। এই মন্দার হাত থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইন্স ১৯২০-এর দশকে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সামনে আনেন। তিনি বলেন যে মন্দাজনিত কারণে যখন চাহিদা হ্রাস পায় তখন রাষ্ট্রকে ঋণ গ্রহণের (Fiscal Deficit) মাধ্যমে পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারী ব্যয় নতুন করে চাহিদার সৃষ্টি করবে এবং অর্থনৈতিক মন্দা দূরীভূত করতে ভূমিকা নেবে। কেইনস এই তত্ত্ব সামনে আনেন নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে যখন সোভিয়েত অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান হচ্ছে আর পুঁজিবাদী অর্থনীতি মন্দায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের দিকে মানুষ যাতে ঝুঁকে না পড়ে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যাতে সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার জন্যই কেইনস এই দাওয়াই প্রয়োগ করেন। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভূমিকা পুঁজিবাদ সে সময়ে মেনে নিতে বাধ্য হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য। সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের হাত থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭০-এর দশকের সূচনা পর্যন্ত প্রায় আড়াই দশক সময়কালকে পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি থেকে এই ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা যায়। ১৯৯১-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের আর কোনো রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাও থাকলো না। ফলে সারা বিশ্বজুড়ে সূচনা হলো নব্য উদার অর্থনীতির। পুঁজির অবাধ চলাচলের পথে যে কোনো অন্তরায়কে সরিয়ে ফেলা হলো। আমদানি কর সহ বিবিধ কর কমিয়ে ফেলা হলো। কর-বহির্ভূত বিভিন্ন বাধাও তুলে দেওয়া হলো। রাষ্ট্রের রাজকোষ ঘাটতি মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩ শতাংশের মধ্যে রাখতে ফিসক্যাল রেসপনসিবিলিটি এন্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট এক্ট (FRBM Act) পাশ করানো হলো সমস্ত দেশগুলোতে। ফলে সরকারের ঋণ করার ক্ষমতা খর্ব করে দেওয়া হলো। পাশাপাশি ধনীদের উপর কর চাপানোও প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে গেল, বলা হলো যে ধনীদের উপর কর চাপালে বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা লাগবে। ফলে সরকারগুলিকে আর্থিক দিক থেকে প্রায় পঙ্গু করে দেওয়া হলো। একইসঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে জলের দরে বেচে দেওয়া, খনিজ সম্পদকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। পুঁজিবাদ একটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিয়ন্ত্রণবিহীন ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জোরালো উপস্থিতির জন্য কিছুদিন সে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল কিন্তু প্রয়োজন শেষ হতেই আবারও স্বমহিমায় ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে পুঁজিবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ব্যাধি—মন্দা। পুঁজির কেন্দ্রীভবনের জন্য চাহিদা হ্রাস পায়। এই চাহিদা বজায় রাখার জন্য পুঁজিবাদের একটা চলতি পন্থা হলো কনজাম্পশন ক্রেডিট, পণ্য কেনার জন্য ঋণ দান। রাষ্ট্র ঋণ গ্রহণ করে খরচ করতে পারবে না, যদিও রাষ্ট্রের খরচের একটি মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট (Multiplier Effect) পড়ে অর্থনীতিতে। কিন্তু তা ব্রাত্য করে রাখা হয়, আর সাধারণ মানুষকে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। শ্রমজীবী মানুষের মজুরি বাড়ে না, কিন্তু ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ে। এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণ একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ঋণ গ্রহণ করতে চান না এবং অপর একটা অংশ ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়ে গেলে কৃত্রিম চাহিদার বুদবুদটা ফেটে যায়। ২০০৮ সালে এইভাবে আমেরিকায় গৃহ ঋণের বুদবুদটি ফেটে পড়ায় নব্য-উদার অর্থনীতি এক দীর্ঘস্থায়ী মন্দায় জড়িয়ে পড়ে যা থেকে অর্থনীতি এখনও বের হয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু নব্য-উদার অর্থনীতি এই সঙ্কটকে সম্বল করে আরও দ্রুতগতিতে সংস্কার ঘটাতে চাইছে অর্থনীতিতে। ফলে সঙ্কট আরও গভীর হচ্ছে। মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে, চাহিদা কমছে, কর্মসংস্থান কমছে, বিনিয়োগ বন্ধ থাকছে।

এইরকম একটা প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই আমাদের নভেম্বর বিপ্লবকে স্মরণ করতে হবে। নব্য-উদার অর্থনীতি তার অন্তিম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে। নব্য-উদার অর্থনীতির সঙ্কটের হাত ধরে নব্য-ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে প্রায় সারা বিশ্বজুড়ে, বিশেষত যে রাষ্ট্রগুলিতে উদার বুর্জোয়া ব্যবস্থা চালু ছিল সেখানে। ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদের সঙ্গে নব্য ফ্যাসিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, নব্য ফ্যাসিবাদ ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদের মতো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে না। ১৯৩০-এর দশকে লগ্নীপুঁজি ছিল জাতিরাষ্ট্রের অধীনে। আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের কারণে ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং যুদ্ধকে কেন্দ্র করে অস্ত্র উৎপাদনভিত্তিক একটি অর্থনীতি গড়ে তোলে। কিন্তু বর্তমানে লগ্নীপুঁজি আন্তর্জাতিক চরিত্র ধারণ করায় আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব স্তিমিত হয়ে আছে। ফলে নব্য ফ্যাসিবাদী দেশগুলি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে না। নব্য উদারনীতি সঞ্জাত অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে নব্য ফ্যাসিবাদ জনগণকে কাছে টানছে, কিন্তু ক্ষমতায় এসে সেই নব্য উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থাই কায়েম করছে। আবার ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় এসেই যেভাবে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছিল, নব্য ফ্যাসিবাদ তা করে না। নব্য ফ্যাসিবাদ নির্বাচনী ব্যবস্থাকে বহাল রাখে, কিন্তু একনায়কতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থা কায়েম করে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যন্তরে থেকে তারা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে পরিবর্তন করে দেয়। আমেরিকা থেকে ভারত সর্বত্র এই প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যদিও ভারতে পুরোপুরি ভাবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি, কিন্তু নব্য-ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ভারতে বিজেপি সরকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

যদিও আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব এই মুহূর্তে স্তিমিত আছে, তা সত্ত্বেও রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে চাপান-উতোর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার প্যালেস্তাইনের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে যেভাবে ইজরায়েল একতরফাভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে তা লেনিনের সেই অমোঘ উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়—'Imperialism and war are Siamese twins'। আশার কথা হচ্ছে এই যে সারা বিশ্বের মানুষ এই হত্যালীলার প্রতিবাদে পথে নেমেছে, তাই ইজরায়েল বাধ্য হয়েছে প্যালেস্টাইনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে।

যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প সারা বিশ্বকে হুমকি দিচ্ছেন আমদানি কর বসিয়ে বিশ্বকে শায়েস্তা করবেন বলে ঠিক তখনই তাঁর নাকের ডগায় বসে নিউইয়র্কে মেয়র পদে জয়লাভ করেছেন জোহরান মামদানি। মামদানি তাঁর নির্বাচনের প্রচারে তুলে এনেছিলেন সাধারণ মানুষের সঙ্কটের কথা, শিক্ষার খরচ, বাড়ি ভাড়ার খরচ, পরিবহনের যে বিপুল খরচ সাধারণ মানুষকে বহন করতে হয় তা উঠে আসে তাঁর প্রচারে। জয়ের পর ঘোষণা করেছেন---I am young, I am Muslim and I am a Democratic Socialist. ঠিক সেই শব্দগুলি যা ডোনাল্ড ট্রাম্প সব থেকে বেশি ঘৃণা করেন। এই জয় প্রমাণ করছে আমেরিকার অভ্যন্তরেই রয়েছে বর্তমান শাসক শ্রেণীর প্রতি তীব্র ক্ষোভ।

এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মার্কিন দেশের কর নীতি। ডোনাল্ড ট্রাম্প চীন, ব্রাজিল, ভারত সহ পশ্চিম ইউরোপের একাধিক দেশের উপর একতরফাভাবে উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক বসিয়ে তাঁর মর্জিমাফিক শর্ত পালনে বাধ্য করতে চাইছেন দেশগুলিকে। চীন এর প্রতিবাদে পাল্টা কর চাপিয়েছে মার্কিন পণ্যে। ফলে সারা বিশ্বই এক অনিশ্চিত বাণিজ্য ব্যবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে। অথচ নব্য উদার অর্থনীতির মূল নীতিই হলো পণ্যের অবাধ চলাচল। যে দেশের নেতৃত্বে এই নতুন অর্থনীতি চালু হয়েছিল তারাই আজ সেই নীতি থেকে সরে আসছে। এটা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে নব্য উদার অর্থনীতি একটা অচল অবস্থায় এসে গিয়েছে। ক্রমশ দ্বন্দ্বগুলিও আরও পরিস্ফুট হচ্ছে।

ভারতের দিকে তাকালেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাব। বিহার বিধানসভা ভোটে জয়লাভের এক সপ্তাহের মধ্যেই বিজেপি সারা দেশে শ্রমকোড চালু করে দিল। এর মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারের উপর তীব্র আক্রমণ নামিয়ে এনেছে বিজেপি সরকার। ২০১৯-২০ সালে এই কোডগুলি আইনে পরিণত হলেও গত পাঁচ বছরে শ্রমজীবী মানুষের তীব্র প্রতিরোধের মুখে তা বিধিবদ্ধ করতে সাহস পায়নি বিজেপি সরকার। এর ফলে আগামী দিনে ইউনিয়ন গঠন করা, ধর্মঘট করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, কাজের সময় ১২ ঘণ্টায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই ৪টি কোডের বিরুদ্ধে যে লড়াই জারি আছে, তা আরও জোরদার করতে হবে। যেভাবে কৃষক সমাজ তিনটি কৃষিবিলকে বাতিল করতে বাধ্য করেছিল মোদি সরকারকে, তেমনভাবেই এই ৪টি শ্রমকোডকে বাতিল করতে বাধ্য করতে হবে মোদি সরকারকে।

শ্রমজীবীদের সমস্ত লড়াইগুলোকে একসূত্রে বেঁধে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতে হবে। তাহলেই আমরা আগামী দিনে একটা সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের ভাষ্য মানুষের কাছে হাজির করতে পারব। □

বেঙ্গল ফাইলস ঃ কিছু কথা

উৎসর্গ মিত্র

সম্প্রতি বাংলায় বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী নামক এক পরিচালকের 'বেঙ্গল ফাইলস' নামে এক চলচ্চিত্রের মুক্তিকে কেন্দ্র করে যার পরনাই আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে চলচ্চিত্রের মুক্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণাও করে দিয়েছে। আজকের এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এভাবে 'নিষিদ্ধ' বা ব্যান করা হাসির উদ্রেক ছাড়া আর কিছু ঘটায় না। তবু ঘটনাটা ঘটেছে এবং তার ফলে আলোড়ন বেড়েছে বৈ কমেনি। বিবেকের ছবি আমি দেখিনি, দেখার আগ্রহও অনুভব করিনি কারণ আমি ওনাকে জানি। বিবেক হচ্ছেন এমন এক পরিচালক, যাঁর কোনও ছবিই বক্স অফিস ওতরায়নি এবং সমালোচকেরা চেষ্টা করেও তাঁর কোনও ছবির প্রশংসা করতে পারেননি। ২০০৫ সালে ভদ্রলোক ছবি করতে নামেন এবং তার পর থেকে একের পর এক ফ্লপের ধাক্কায় শেষে কিছু দিন হলো নানা 'ফাইলস' নাম দিয়ে ছবি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যার প্রায় সবগুলিই ইতিহাসের নাম করে আসলে বিকৃত ইতিহাস। এর মধ্যে 'কাশ্মীর ফাইলস' কিছুটা পয়সার মুখ দেখেছে মূলত বিজেপি সমর্থকদের কল্যাণে। বিজেপি-র সর্বভারতীয় নেতারা এটি সর্বত্র দেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন কারণ এতে খোলাখুলি মুসলমান সম্প্রদায়কে হেয় করা হয়েছিল, যা বিজেপির দর্শনের সাথে একেবারে একাকার।

বিবেক আদতে একজন 'প্রপাগান্ডিস্ট' বা একনিষ্ঠ প্রচারক এবং পরিষ্কার করে বলতে গেলে নরেন্দ্র মোদির প্রচারক (কথাটা তিনি নিজেই স্বীকার করেন এবং এই কারণেই মোদির আমলে তিনি কিছু পুরস্কারও পেয়েছেন আর কোনও যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তিনি সেন্সর বোর্ড এবং আই সি সি আর-এর একজন সম্মানিত সদস্য)। এহেন লোকের ছবি পয়সা দিয়ে দেখার ইচ্ছা না থাকাটাই স্বাভাবিক, আমারও তাই হয়েছে। তাছাড়া সিনেমা দেখে ইতিহাস শেখার অভিরুচি কোনও সচেতন মানুষেরই থাকার কথা না।

সুতরাং বিবেকের ছবি করা আমায় বিচলিত করেনি, আমায় বিচলিত করছে এই ছবির মাধ্যমে প্রায় আশি বছর ধরে কবরে পোঁতা এক ঘটনাকে ফের খুঁড়ে বের করে আনার চেষ্টা চলছে দেখে। ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এবং চেষ্টা করা হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে স্বাধীনোত্তর বাংলায় কল্কে না পাওয়া হিন্দু-মুসলিম আবেগকে বিকৃত ভাবে ফের উসকে দিয়ে আগামী বছর ভোট বৈতরণী পার করে দিতে।

কলকাতায় ছেচল্লিশের দাঙ্গা, যাকে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' বলা হচ্ছে, তার কথা জানতে গেলে আরও একটু আগে থেকে জানা শুরু করতে হবে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে স্বাধীনতার লড়াইটা দেশে হিন্দু-মুসলিম কম-বেশি এক সাথেই লড়েছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলনের কথাই বলুন বা নেতাজির ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির কথাই বলুন, হিন্দু এবং মুসলমান আলাদা করে লড়াই করেছে— এমন কথা অন্তত শিক্ষিত মানুষরা কোনও দিন বলতে পারবে না। আন্দোলনে জর্জরিত ব্রিটিশ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। কিন্তু তারা চেয়েছিল কোনও রকম সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি না করেই ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটাতে। সেই অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্রিপসের নেতৃত্বে যে 'ক্যাবিনেট মিশন' ভারতে আসে, তারা ওই বছর ১৬ মে দুটি প্রস্তাব দেয়— এক, পরের বছর কোনও এক সময়ে শাসন ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানো হবে, প্রাথমিক ভাবে সরকার গঠিত হবে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে (কোনও নির্দিষ্ট সময় তখন ঘোষণা হয়নি) এবং দুই, স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা হবে ত্রিস্তরীয়— কেন্দ্র, গুচ্ছ রাজ্য (group of provinces) এবং রাজ্য। এরকম প্রস্তাব করা হয়েছিল কারণ ব্রিটিশ ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের একটি, মুসলিম লীগ, ১৯৪০ সালে তাদের লাহোর অধিবেশন থেকে দাবি তুলতে থাকছিল দেশের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিকে নিয়ে পৃথক 'স্বাধীন রাজ্য' গঠিত করার। ব্রিটিশ প্রস্তাবিত 'গুচ্ছ রাজ্য' তাদের সেই দাবি মেটাতে সক্ষম ছিল। কি ব্রিটিশ, কি মুসলিম লীগ, কি কংগ্রেস— কারও তরফ থেকেই তখনও পর্যন্ত দেশ বিভাজনের কথা উল্লেখিত হয়নি, বরং উভয় দলই ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রাথমিক ভাবে মেনে নিয়েছিল।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী দুই দলের (কংগ্রেস ছিল মূলত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের দল) একত্রে মেনে নেওয়াটা ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। মৌলনা আবুল কালাম আজাদের ভাষায়, "It (The Cabinet Mission Plan) meant that the difficult question of Indian freedom had been settled by negotiation and agreement and not by methods of violence and conflict. It also seemed that the communal difficulties had been finally left behind. Throughout the country there was a sense of jubilation and all the people were united in their demand for freedom" (ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব একযোগে মেনে নেওয়ার অর্থ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথের জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান সংঘাত ব্যাতিরেকে আলোচনার টেবিলেই করে ফেলা সম্ভব হলো। এতে আরও মনে হয় যে দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলিকে আপাতত পেরিয়ে আসা গেল। সারা দেশ এখন একত্রিত এবং আশু স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে উদ্বেলিত)—India Wins Freedom, Azad Moulana Abul Kalam, Delhi, 1959।

দেশে পরবর্তী ঘটনাবলী অবশ্য অন্য কথা বলে। এ কথা অনস্বীকার্য যে দেশের মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ শুধুমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ছাড়া অন্য সময়ে মুসলমানদের ব্রাত্য করেই রেখে দিত। এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামের আবহের মধ্যেও দেশে স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পর্যন্ত হিন্দু এলাকায় হিন্দু প্রতিনিধিই একমাত্র জিততে পারত। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সে নির্বাচনে জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে কংগ্রেসই প্রায় সমস্ত হিন্দু এলাকায় জয়লাভ করে। মুসলিম লীগের জয় আসে মূলত মুসলিম প্রধান এলাকাগুলির থেকে। তাও তৎকালীন দেশের সবচাইতে ধনী মুসলিম প্রধান রাজ্য পাঞ্জাবে লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হয়।

ধনী মুসলিমদের বড়ো অংশ সেদিন কংগ্রেসের পক্ষেই তাঁদের রায় দিয়েছিলেন। ফলে ক্যাবিনেট মিশনের ফর্মুলা অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের একটা আসন বেশি হয়ে যায় মুসলিম লীগের তুলনায়। এতে লীগ প্রমাদ গোনে। লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্তই কার্যকর করার পক্ষে রায় দেয়। তারা মুসলিমদের বোঝাতে শুরু করে যে পুরোটাই কংগ্রেসের চক্রান্ত এবং মুসলিমদের সম্মানের সাথে বাঁচতে গেলে পৃথক দেশের জন্যে আন্দোলন চালানো উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সাথে এক দেশে থাকলে মুসলিমদের 'সংখ্যালঘু' হয়েই থাকতে হবে এবং কিছুতেই তাদের মঙ্গল হবে না। এই প্রশ্নে অবশ্য করেই লীগের মধ্যে মতবিভেদ ছিল। কিন্তু পৃথক দেশের বিরোধিতাকারীরা ছিলেন সংখ্যালঘু। অবশেষে কয়েক সপ্তাহের টানাপোড়েনের পর এবং পৃথক দেশের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্যে উপর মহলে নানা তদ্বির করে ব্যর্থ হওয়ার পর লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব খারিজ করে দেয় এবং ২৯ জুলাই, ১৯৪৬ তারিখে লীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হিসেবে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পরবর্তী ১৬ আগস্টের দিনটিকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' হিসেবে পালন করার ডাক দেন।

এই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'তে কিন্তু কোনও সংঘাতের ডাক ছিল না। লীগ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' বলতে মুসলিমদের ওই দিন পৃথক দেশের দাবিতে সরাসরি (ডাইরেক্ট) পথে নামার কথা বলেছিল। কথা ছিল ওই দিন দেশের সমস্ত মুসলিম স্ব স্ব জায়গায় ধর্মঘট পালন করবেন এবং পৃথক দেশের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ ইত্যাদিতে সারা দিন ধরেই রাজপথ ভরিয়ে রাখবেন। গোটা দেশেই সেই মোতাবেক কর্মসূচী পালিত হলেও এবং কোথাওই কোনও গণ্ডগোল দেখা না দিলেও সমস্যা ঘটে গেল একমাত্র বাংলায়।

সেই সময়ে বাংলার পরিস্থিতি একটু জটিলই ছিল। এই রাজ্যে তখন ৫৪ শতাংশ মুসলিম আর ৪৪ শতাংশ হিন্দু এবং এই মুসলিমদের বেশি অংশটাই আবার রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে (অধুনা বাংলাদেশ) বসবাস করতেন। রাজ্যবাসীর অধিকাংশ মুসলমান হওয়ার কারণে এখানে ১৯৩৫ সাল থেকেই (অর্থাৎ স্বায়ত্ত শাসনের সূচনা থেকেই) শাসন ক্ষমতায় মুসলিম লীগই ছিল (গোটা দেশে এটাই একমাত্র)। বিরোধী আসনে ছিল কংগ্রেস এবং একটি হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী দল, নাম 'হিন্দু মহাসভা'। এই হিন্দু মহাসভাকে আবার কলকাতার ধনী মারোয়াড়িকুল দু'হাত তুলে সমর্থন করত। অর্থাৎ সেই সময়ে বাংলা ছিল এমন এবং একমাত্র একটি রাজ্য, যেখানে সামগ্রিক ভাবে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ রাজধানীর অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত হিন্দুরা, সেখানে আবার তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ (১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ৭৩ শতাংশ) এবং এখানকার মুখ্যমন্ত্রী একজন মুসলিম, নাম হুসেন শাহীদ সুরাওর্দি।

এই সুরাওর্দি লীগের নেতা হিসেবে নিজেকে জিন্নাহ-এর থেকে বেশি যোগ্য মনে করতেন এবং চেষ্টাও করতেন সেটা প্রমাণ করবার। অথচ প্রশাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যর্থ। ১৯৪৩ সালে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে প্রায় তিরিশ লক্ষ লোক মারা যান, তার জন্যে বাঙালি, বিশেষ করে হিন্দু বাঙালি এই সুরাওর্দিকেই দায়ী করেন। তবুও রাজ্যে বসবাসকারী উর্দুভাষী মুসলমানদের (যাঁদের অধিকাংশই উত্তর ভারত থেকে এসেছিলেন এবং মূলত শহরে বাস করতেন) একটা বড়ো অংশ যে কোনও কারণেই হোক তাঁকে বেশ পছন্দ করতেন। তবে এঁদের সংখ্যা ছিল রাজ্যের বাঙালি মুসলিমদের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলিমরা মূলত বাস করতেন গ্রামাঞ্চলে আর কলকাতার সংখ্যালঘু (জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ) মুসলিমদের বাস ছিল মূলত উত্তর কলকাতায় এবং তাদের প্রায় সবাই নিম্নবিত্তের; পেশায় হয় রাজমিস্ত্রি অথবা কারখানার শ্রমিক অথবা রিকশাওয়ালা কিংবা অন্যের বাড়ি মজুর খাটা লোকজন। মধ্য আর দক্ষিণ কলকাতা ছিল সামান্য কিছু ইউরোপিয়ান বাদ দিলে মূলত হিন্দু অধ্যুষিত। মধ্যবিত্ত মুসলমানের সংখ্যা এখানে ছিল হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় অনেক কম আর ধনী বা ব্যবসায়ী মুসলমানের সংখ্যা মারোয়াড়িদের তুলনায় ছিল একেবারেই নগণ্য। জিন্নাহ্ যখন তাঁর শান্তিপূর্ণ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র ডাক দিলেন, তখন এটাই ছিল কলকাতার পরিস্থিতি। সারা ভারত সেই দিন শান্ত ছিল, এমনকি মুসলিম প্রধান রাজ্য পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশও শান্ত ছিল কর্মসূচীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে, শুধু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে গেল আমাদের এই কলকাতায়।

কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটার সুস্পষ্ট জবাব আজও অধরা। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ পুলিশ তাদের রিপোর্টে হিন্দু এবং মুসলমান— উভয় সম্প্রদায়কেই সমান ভাবে দায়ী করেছে, কিন্তু বাস্তব হলো পরস্পরের মধ্যে চলতে থাকা অবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ওই দিন দুই সম্প্রদায়েরই মধ্যে থাকা দুষ্কৃতিরা ১৬ আগস্ট থেকে শুরু করে টানা চার দিন পর্যন্ত এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিল, যাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল কয়েক হাজার নিরীহ নগরবাসীকে, যাদের প্রায় সবাই-ই ছিলেন গরীব মানুষ। নিহতের সঠিক সংখ্যা সেদিনও বলা যায়নি, আজ তো দূরস্থান। কেউ বলেন পাঁচ হাজার, কেউ বলেন দশ— আহতের সংখ্যা ধরলে সংখ্যাটা নাকি পনেরোয় পৌঁছে যাবে। কিন্তু যেটাই হোক, আহত বা নিহতদের সবাই ছিলেন গরীব মানুষ এবং এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। এর দায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুরাওর্দি এড়াতে পারেন না এবং এই একটি ঘটনাই দেশ বিভাজনের সমস্ত রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

ঘটনার উস্কানি প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে কংগ্রেস এবং লীগ — উভয় দলেরই ভিন্ন বক্তব্য এসেছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট ময়দানে বিশাল সমাবেশে (জমায়েত ছিল প্রায় এক লক্ষ) মুখ্যমন্ত্রী সুরাওর্দি যে ঝাঁঝালো বক্তব্য রেখেছিলেন এবং যেভাবে সেখানে বলেছিলেন যে এই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র দিনে তিনি পুলিশকে 'সংযত' থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে খুনীরা খুন করার লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ঘটনার দিন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে তাঁর টানা উপস্থিতি পুলিশকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেয়নি। তবে পরের দিন, অর্থাৎ ১৭ আগস্ট সংবাদপত্রে সুরাওর্দির ওই ধরনের কোনও বক্তব্যের কথা ছাপা হয়নি। পুলিশের রিপোর্টেও সে সব ছিল না। পুলিশের অবশ্য বক্তব্য ছিল যে তাদের কাছে উর্দু স্টেনোগ্রাফার না থাকায় তারা পুরো রিপোর্ট কভার করতে পারেনি। স্বাভাবিক ভাবেই সুরাওয়ার্দি সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন।

সবচেয়ে অবাক করা ভূমিকা ছিল তৎকালীন বড়লাট বারোজের। ঘটনার সময়ে তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। এরপর তিনি যখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সেনা তলব করেন, তখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। এই কাজটা তিনি যদি প্রথমেই করতেন, তাহলে এতগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ কিছুতেই যেত না। দেশ বিভাজনও সম্ভবত এড়ানো যেত।

ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণে আমি যাবো না কারণ পাঠককে বিব্রত করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। ওই ঘৃণ্য দাঙ্গার ঘটনার যে দিকগুলো উঠে এসেছে বিশ্লেষণে, আমি শুধু সেগুলিকে উল্লেখ করব—

প্রথমত, ছেচল্লিশের এই দাঙ্গায় প্রতিটা নরহত্যা ঘটানো হয়েছিল অত্যন্ত বর্বরোচিত ভাবে। শুধুমাত্র যে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছিল তাই নয়, খুন করার পর প্রতিটা শবদেহকে যেভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল, তা অকল্পনীয়। ভারতে সেদিনই যে প্রথম দাঙ্গা ঘটেছিল তা নয়। দাঙ্গার সময়ে প্রবল আক্রোশে খুনী কোথাও কোথাও যে শবদেহ বিকৃত করেনি, এমনটাও নয়, কিন্তু কলকাতায় যে ব্যাপকতায় শব-বিকৃতি ঘটানো হয়েছিল, তা আর কোথাও দেখা যায়নি। কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নয়, এ ঘটনা ঘটেছিল উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত, কলকাতার দাঙ্গার আগে দেশে বহুবার দাঙ্গা হয়েছে। সে সব জায়গায় খুন, জখম, অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদি সবই হয়েছে, কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা ছিল না। কলকাতায় ধর্ষণটাও হয়েছে। এর পর থেকে দাঙ্গার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্ষণ; অর্থাৎ দাঙ্গায় ধর্ষণের পথ দেখিয়েছিল কলকাতা। ধর্ম নির্বিশেষে নিম্নগামীতার দগদগে উদাহরণ হয়েছিল সেদিনের কলকাতা। বাঙালি হিসেবে এটা লজ্জার।

তৃতীয়ত, এটা সরাসরি প্রমাণ করা যাবে না, তবু ঘটনাবলীর চরিত্র এটাই নির্দেশ করে যে পুরো দাঙ্গাটাই ঘটানো হয়েছিল উভয় সম্প্রদায়ের ধনিক শ্রেণীর পোষা দুষ্কৃতিদের (underworld) দ্বারা। অর্থাৎ এর উদ্গাতা ছিল ধনিকরা আর তার শিকার হয়েছিল নিরীহ গরীব মানুষ, যাদের প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। উল্লেখ্য যে, এই সব নিহতদের বেশির ভাগ অংশই ছিল মুসলমান। ঠিক কত শতাংশ শবদেহ মুসলমানদের ছিল, তা সঠিক ভাবে বলা যাবে না কারণ দেহ গণনার কোনও উপায় সে সময়ে ছিল না। শুধু এটুকু বলা যায় যে, উত্তর কলকাতা ছিল মুসলমান অধ্যুষিত এবং খুনোখুনির প্রায় সবটাই ঘটেছিল উত্তর কলকাতাতেই। ধনিকদের গায়ে আঁচড়টুকুও সেদিন পড়েনি। সামান্য কিছু ধনী মুসলমান বা হিন্দুদের বাড়ি আক্রান্ত হলেও হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায় না।

ঘটনাবলীর সামগ্রিকতা ও ব্যাপকতার নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কলকাতায় ছেচল্লিশের দাঙ্গা কোনও হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়, বরং এ ছিল এক দীর্ঘমেয়াদী অভীপ্সার ফসল। বৃহদাকারে এই অভীপ্সা ছিল হিন্দু গুণ্ডাদের— তাদের লক্ষ্য ছিল গরীব মুসলমানরা আর ক্ষুদ্রাকারে অভীপ্সা ছিল মুসলমান গুণ্ডাদের— গরীব হিন্দুদের খুন করে তারা বীরত্ব দেখিয়েছিল আর উভয় পক্ষের গুণ্ডাদেরই পুষত স্ব স্ব ধর্মের ধনিকরা। মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল কসাইরা আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা ছিল দারওয়ানদের, যাদের সাথে প্রায়শই দুষ্কৃতিদের যোগাযোগ থাকত। গরীবের বেঁচে থাকার অধিকারের প্রতি ধনীদের প্রকট এবং বিকট তাচ্ছিল্যের ফলই ছিল সেদিনের সেই গরীব নিধন। সঠিক ভাবেই ডক্টর সুরঞ্জন দাস তাঁর বইতে একে "অভিজাতের সাম্প্রদায়িকতা" বলে বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর মতে পরে বুদ্ধিজীবীদের হাত ধরে "জনতার সাম্প্রদায়িকতায়" পরিণত হয়েছিল। 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালনের আহ্বানের সাথে এর কোনও সম্পর্কই ছিল না। 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'কে সেদিন ব্যবহার করা হয়েছিল মাত্র।

এই কথাটা কংগ্রেস যেমন জানত, মুসলিম লীগও তেমন জানত। ঘটনার পরপর বাংলা সরকার এক অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার প্যাট্রিক স্পেন্সের নেতৃত্বে। সেই কমিটি তার কাজ শেষ করলেও তার রিপোর্ট দিনের আলোর মুখ দেখেনি এই কারণেই। সুতরাং ঘটনার সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত খুঁজলে অনেক 'প্রত্যক্ষদর্শী'র সন্ধান পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায় তাদের সবকয়টিই পক্ষপাতদুষ্ট। দুই সম্প্রদায়েরই 'প্রত্যক্ষদর্শী'রা বিপরীত সম্প্রদায়ের ওপর দায় চাপিয়েছে অবলীলায়। এই কারণেই দুই সম্প্রদায়ের বাইরের কারুর বিবরণ পেলে সঠিকতার অন্তত কিছু কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। এরকমই একজন ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস টুকার। ঘটনার সময়ে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সেনা বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান। তাঁর আত্মজীবনীতে দাঙ্গার কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায়। একেবারে নিরপেক্ষ বলা যাবে না সেই বিবরণী, তবে অন্যান্য লেখা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সাথে সেগুলি মেলে। তিনিও কিন্তু উভয় সম্প্রদায়কেই সম ভাবে দায়ী করেও কংগ্রেসের দিকেই দায়ের পাল্লা ভারী রেখেছেন।

যে যাই বলুক, সেই সময়ের আম কলকাতা ছিল সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে একেবারে আড়াআড়ি বিভক্ত। এই বিভাজন ক্যালকাটা কিলিং-এর অনেক আগে থেকেই কলকাতাবাসীর মনে ঘাঁটি গেড়ে রেখেছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যতই হাত ধরাধরি করে আন্দোলন চলতে থাক না কেন, পারস্পরিক অবিশ্বাসেরও কোনও কমতি ছিল না। এমনকি স্বাধীনতার পরেও এই ধারা ছিল অব্যাহত। বলা চলে ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি শান্তি স্থাপনে গান্ধিজীর উদ্যোগের পর থেকে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হতে শুরু করে। বাংলাকে দুই টুকরো করে স্বাধীনতা লাভ করার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। বলার মতো বিষয় হলো, দু-একজন বাদ দিলে কলকাতায় বসবাসকারী মুসলমানদের প্রায় কেউই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাননি, তাঁরা এখানেই ছিলেন, ঠিক আগে যেমন ভাবে থাকতেন। এরপর একটা সময় এলো, যখন উভয় সম্প্রদায়ের মন থেকেই দাঙ্গার স্মৃতি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে গেল। পরিস্থিতি তখন একেবারে স্বাভাবিক।

মজার কথা হলো, এখান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যাঁরা চলে গিয়েছিলেন, কিংবা যাঁরা আগে থেকেই সেখানে বাস করতেন, তাঁরাও কেউ পরবর্তীকালে এই নিয়ে আর মুখ খোলেননি, উভয় দিকেই বিরাজ করেছে চরম নিস্তব্ধতা। ভারতের দিক দিয়ে বলা যায় যে এখানকার রাজনৈতিক মহল অতীতকে আঁকড়ে না ধরে থেকে নতুন ভাবে দেশ গড়াকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তাছাড়া বেশির ভাগ মুসলিম, বিশেষ করে গরীব মুসলিম এখানেই থেকে যাওয়ায় এবং নতুন ভাবে জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় দাঙ্গা নিয়ে আলোচনার মধ্যে তাঁরা কোনও লাভ খুঁজে পাননি। দাঙ্গায় হিন্দুরা প্রধান ভূমিকা পালন করলেও নতুন বাস্তবতায় তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। ফলে, কালে কালে কলকাতায় দাঙ্গার স্মৃতি এ দেশে মাটির তলায় চলে গিয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে ছিল আবার অন্য বাস্তবতা। যত দিন গেছে, ততই তাঁরা নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে আলাদা অনুভব করেছেন। অতীত রোমন্থনে আগেকার দিনে যখন দুই বাংলা এক ছিল, তখনকার সুখস্মৃতিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পরিস্থিতি পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মঞ্চ হোক একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরস্থ অন্যতম মর্যাদা সম্পন্ন সংগ্রামী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন আগামী ১০-১২ জানুয়ারি, ২০২৬ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ১৯৫৬ সালে সংগঠনের গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পথ চলা শুরু। দীর্ঘ সংগ্রাম মুখর পথ বেয়ে তেতাল্লিশ বছর পর কৃষ্ণনগর শহরে দ্বিতীয়বার রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে। পূর্বে ১৯৮২ সালে সপ্তম রাজ্য সম্মেলনের সময়টি রাজ্য কর্মচারীদের কাছে ছিল স্বর্ণ যুগ। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে কর্মচারী স্বার্থবাহী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধারাবাহিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তবতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্য সম্মেলন। ১৯৮২-তে অনুষ্ঠিত সপ্তম রাজ্য সম্মেলনের সময় শ্লোগান ছিল বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করো, বামফ্রন্ট সরকারকে শক্তিশালী করো। সে সময় সরকারী কর্মচারীরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরকারী দপ্তর, পঞ্চায়েত, পৌরসভায় কাঠামো আছে, কিন্তু গণতন্ত্র নেই। আজকের শাসকশ্রেণী যে নীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করছেন তার পেছনে কাজ করছে গভীর রাজনীতি। সারা দেশের ন্যায় আমাদের রাজ্যে যখন ধর্মীয় বিভাজনের অপকৌশল চলছে, সেইরকম বাতাবরণে নদীয়া জেলায় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ষোড়শ শতকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, শূদ্র, ভিনধর্মী সমস্ত অংশের মানুষকে এক জায়গায় সূত্রায়িত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। পাঁচশো বছর আগে নবদ্বীপ শহরে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্যোগে জাত-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে জনমানসের নগরকীর্তন প্রাধান্য পেয়েছিল। শুধুমাত্র চৈতন্যদেবই নন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ডি. এল রায়ের মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিরা ছিলেন এই জেলায়। স্বাভাবিকভাবে এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এই জেলা।

১৯৮২ সালে সপ্তম রাজ্য সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন লড়াইটা ছিল অধিকার অর্জনের, আর আজকের লড়াই অর্জিত অধিকার, গণতন্ত্র রক্ষার। আক্রমণ শুধু কর্মচারীদের অধিকারের উপর তা নয়, সারা দেশের সাধারণ নাগরিকের জীবন-যন্ত্রণা প্রতিদিন বাড়ছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খাওয়া মানুষ কীভাবে আগামীদিনে বেঁচে থাকবে সেটা সব অংশের মানুষের উপলব্ধিতে আসছে না। জীবনের এই সত্যটা যাতে বুঝতে না পারে তার জন্য একটা ধুম্রজাল তৈরীর চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নয়া শুল্ক নীতি আমাদের দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব, নাগরিকত্বের দোহাই দিয়ে হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো—এগুলির সাথে বহু বিষয় সম্পর্কযুক্ত যা নিয়ে আমাদের বড় বড় প্রচার মাধ্যমে কোনো আলোচনা হয় না। প্রতিদিন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে টিভি চ্যানেলগুলি তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে আমাদের মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আসলে কর্পোরেট স্বার্থবাহী এই ধরনের মিডিয়া জনসাধারণের আলোচনার পরিসরকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বেঁধে দিতে চাইছে। নাগরিকত্ব, জাতপাত, ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরী করে মুখোশের আড়ালে এমনভাবে বিষয়গুলি উত্থাপিত করা হচ্ছে যেন দেশের আর কোনো সমস্যা নেই। এমন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করো, যাতে জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে জাতপাত, ধর্মীয় বিভাজনের মধ্যেই নিজেকে বেঁধে রাখা যায়। প্রশ্ন হল, এটাই কি সুস্থভাবে সমাজে জীবনধারণের একমাত্র পথ? সাময়িকভাবে বাঁচলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কীভাবে জীবন কাটাবে, কীভাবে সমাজের সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে তার কোনো দায় এই প্রজন্মের নেই।

সারা দেশে শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনে নেমে আসছে এক গভীর অন্ধকার। কর্পোরেট স্বার্থবাহী নয়া শ্রমকোড লাগু করা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য কর্পোরেট স্বার্থে শ্রমিক-কর্মচারীদের দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত অধিকারগুলি যে শ্রম আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছিল, তা বাতিল করে যথেচ্ছ শোষণ ও মুনাফার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা। ছাঁটাই, কাজের ঘণ্টা বাড়ানো, ন্যূনতম মজুরির উপর আঘাত, সামাজিক প্রকল্প ছাঁটাই সহ একাধিক সমস্যায় জর্জরিত দেশের শ্রমজীবী জনগণ। কেন্দ্রের সরকার আম্বানি-আদানি সহ অন্যান্য কর্পোরেট সংস্থার জন্য বিপুল পরিমাণ কর মকুব করছে। অথচ গরিব খেটে খাওয়া মানুষের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবি উত্থাপন করে আন্দোলন সংগঠিত করলে তা দমিয়ে দেবার নানান পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষিত যুবসমাজের কাজের কোনো নিরাপত্তা নেই, স্থায়ী কাজ বা অবসরকালীন ভাতা নেই, নয়া উদারনীতির আগ্রাসী বাস্তবায়নে কেন্দ্রের সরকার মরিয়া। শুধুমাত্র পুঁজিবাদী মদতপুষ্ট দেশী-বিদেশী কর্পোরেটদের মুনাফার হারের বেপরোয়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রসমূহ যেমন ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, কয়লা, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, বিমান, জল, প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন সহ সমস্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রকে তুলে দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেট হাঙরদের হাতে। কার্যত দেশে আর এস এস মদতপুষ্ট এন ডি এ জোট সরকারের মদতে জাতীয় সম্পদের লুঠ চলছে। কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থে শ্রমিক বিরোধী যেসব নীতি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে চলেছে তার পরিণতিতেই দেশের কর্মহীনতা, দারিদ্র্য ও অসাম্য চরম আকার নিয়েছে। ছেঁটে ফেলা হয়েছে দেশের সম্পদের প্রকৃত সৃষ্টাদের ন্যূনতম মজুরি, শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা সহ শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণমূলক সরকারী প্রকল্পগুলি। শোষণ ও আয়ের ক্রমবর্ধমান অসাম্যকে প্রতিহত করতে, সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টাকে রুখতে দেশবাসীর সাথে সামগ্রিক অন্যায়ের সম্মিলিত প্রতিবাদের সময়োপযোগী রূপরেখা নির্ধারিত করতে হবে সম্মেলন থেকে।

আমরা এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা শ্রমজীবীদের এই ঐক্য গড়ে তোলোর প্রক্রিয়ায় শামিল ছিলাম, এখনও আছি। শুধু তফাৎ ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে অনুকূল বাতাবরণ, প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আমাদের সুযোগ করে দিয়েছিল সামগ্রিক সাংগঠনিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত করার জন্য। ২০১১ সাল থেকে বর্তমান প্রজন্মের কর্মচারীরা এক অপরিচিত আক্রমণ ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে থাকে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়, দাবি-দাওয়া উপেক্ষিত হতে থাকে। নামতে শুরু করে অনৈতিক বদলি সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক আক্রমণ। জেলায় জেলায় এমনকি প্রশাসনের বাইরের রাজনৈতিক শক্তিও কর্মচারীদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা করতে শুরু করে। এমতাবস্থায় বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংগঠনও আন্দোলন-সংগ্রামের পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। মাঝে দীর্ঘ সময় এই ধরনের কোনো কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও, ১৯৭৭ পূর্ববর্তী প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলার অভিজ্ঞতা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই সংগঠন বুক চিতিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সময়ের নিরিখে সমাজ ও অর্থনীতির বহু পরিবর্তন হয়েছে, অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় শ্রমিকশ্রেণী বা শ্রমজীবী জনগণ বর্তমানে বিপুল প্রতিকূলতার মুখোমুখি। প্রথমত, উৎপাদনের উপকরণের আধুনিকীকরণের নামে বৃহদাকার শিল্প সংস্থার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। একইভাবে সরকারী দপ্তরে কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হওয়ার সুযোগ কমছে। ধর্মঘটের আইনি স্বীকৃতি রয়েছে এমন সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার দূরের কথা, ন্যূনতম সংগঠন করার অধিকারটুকুও নেই। এতদসত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষকে দমানো যায়নি। নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে চলেছে। সংগঠিত বা অসংগঠিত ক্ষেত্র বা সংগঠন নির্বিশেষে ঐক্য গঠনের প্রক্রিয়াও অতীত সময় থেকে বেশি জোরদার হচ্ছে।

শ্রম দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামের অগ্রগতির পূর্ব শর্ত যেমন শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য, তেমনি শাসকশ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ভাঙা। তাই শ্রমিকশ্রেণী শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যাতে ঐক্য গড়ে না ওঠে এবং সংগঠিত ঐক্যকে ধ্বংস করা যায় সে সম্পর্কে নানান কৌশল অবলম্বন করে। বর্তমান ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের হাতিয়ার করে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। কারণ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে তৈরী হওয়া ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবের বাইরে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের বেশ কিছু অংশ রয়েছে। এসব অংশের ওপর সুবিধাবাদী, সংস্কারবাদী বা শাসকশ্রেণী মদতপুষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব রয়েছে। ফলত চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের ধারার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল বিপুল অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে শাসকশ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করার প্রচণ্ড আগ্রহ। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব আমাদের।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল শোষণ। এটা সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মচারীদের সচেতন করা যেমন আমাদের একটা কাজ, তেমনি শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটানোও যে-কোনো সচেতন ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কাজ। একই সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং যাদের বিভেদকামী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরী হয়, তাদের ভূমিকাটাও উন্মুক্ত করা। আমাদের দায়িত্ব সব অংশের শ্রমজীবী মানুষের নয়া উদারনীতির ফলস্বরূপ দৈনন্দিন জ্বলন্ত সমস্যাবলী নিয়ে তীব্র সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রেণী সচেতনতা গড়ে তোলা ও আন্দোলন সংগ্রামকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের সাথে যুক্ত করে। শ্রেণী আদর্শের উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা। এটা ঠিক যে দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম না হলেও ক্রমবর্ধমান তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপানোর জন্য একের পর এক অর্জিত অধিকার হরণের পাশাপাশি প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক কাঠামোকে ব্যবহার করে এবং বাইরে থেকে যে ধরনের আক্রমণের ধারাকে সমাজ জীবনের সর্বদিকে সংহত করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন কায়দায় সংহত করা হচ্ছে, তার সাথে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে নানান আদেশনামা জারির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বোপরি সমাজের সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর আক্রমণ আসলে ফ্যাসিস্ট সুলভ মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য। তাই শুধুমাত্র কর্মচারী আন্দোলন নয়, পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে সমস্যা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণকে প্রতিহত করে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সংগ্রামের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। যৌথ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করা। বর্তমানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে হিংস্র আক্রমণ নেমে আসছে, সেক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে Unity in action-কে জীবন্ত করে বৃহত্তর আন্দোলনের সাথে সাযুজ্য রেখে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর পূর্ব শর্ত হচ্ছে মিছিল, মিটিং, আদায়যোগ্য দাবি নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে কর্মচারীদের কাছে পৌঁছে তাদেরকে সংগঠনের পতাকাতলে নিয়ে আসা। সাংগঠনিক কাজে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে চেতনাকে উন্নত করা। অনেক সময় আমরা এই প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচীগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব না দিলেও শাসকশ্রেণী গুরুত্ব দেয়। কর্মচারীরা যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সংগঠিত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রশাসনিক আক্রমণ চালানো হয়। সুতরাং আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্ত ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে রূপায়ণ করাই প্রাথমিক দায়িত্ব। যে-কোনো ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী তথা সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। শ্রমিক-কর্মচারীর অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামের পূর্বশর্ত অধিকার রক্ষার গণতান্ত্রিক বাতাবরণ তৈরী করা।

আসুন, অর্জিত অধিকার রক্ষার দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলি। এই আন্দোলন আগামীতে একদিন, দুদিন বা তিনদিনের কর্মসূচীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। আন্দোলন চলবে নিরন্তর। আন্দোলন সংগঠিত হবে জেলা সদর থেকে ব্লকে, অফিসে-অফিসে, অধিকার রক্ষার সংগ্রামে। গায়ে-গতরে খাটা দরিদ্র মানুষ যখন আন্দোলনের হাতিয়ারকে প্রয়োগ করতে চান, তখন মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ সেই লড়াইয়ের বাইরে থাকতে পারে না। সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে পরিস্থিতি পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মঞ্চ হোক একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন। □

নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র হিসাবে জোহরান মামদানির জয় ঃ একটি বিশ্লেষণ

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

গত ৪ আগস্ট, ২০২৫ আমেরিকার বাণিজ্য রাজধানী নিউ ইয়র্ক শহরের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত, বামপন্থী মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন চৌত্রিশ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী ও 'ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকা'-র সদস্য জোহরান মামদানি। প্রায় ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি জয়ী হয়েছেন। নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচনে প্রায় ২১ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছেন। তার মধ্যে ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার ভোট পেয়েছেন মামদানি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, নির্দল প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো সাড়ে আট লক্ষ ভোট পেয়েছেন। তিনি মামদানির দলেরই দক্ষিণপন্থী অংশের নেতা। এছাড়াও, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া প্রায় দেড় লক্ষের মতো ভোট পেয়েছেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, স্লিওয়া তাঁর নিজের দলের প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও ৩ আগস্ট রাতে ভোটের ঠিক আগে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বামপন্থী মামদানিকে হারানোর জন্য কুওমোর পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এবং স্লিওয়াকে ভোট দেওয়া মামদানির পক্ষে ভোট দেওয়ার সমান বলে দাবি করেন ট্রাম্প ও এলন মাস্ক। মামদানিকে হারানোর জন্য এলন মাস্ক থেকে শুরু করে ট্রাম্পের ধনকুবের পৃষ্ঠপোষকরা কুওমোকে ৪ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য করেছেন গত কয়েক মাস ধরে, যার মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ডলার শুধু মামদানির বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে, তাঁকে কমিউনিস্ট, জেহাদি, ইহুদী বিদ্বেষী, তৃতীয় বিশ্বের নর্দমা থেকে উঠে আসা, ইত্যাদি বলে আক্রমণ করতে ব্যয় করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ট্রাম্প ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে বলেছেন যে মামদানি জিতলে তিনি নিউ ইয়র্ক শহরের জন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ করে দেবেন!

গত এক বছর ধরে মামদানি ৩০ লক্ষ মানুষের কাছে পায়ে হেঁটে গিয়ে তাঁকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়াকে তিনি অভিনব রূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং বিল অ্যাকমান, এলন মাস্কের মতো কোটিপতি প্রভাবশালীরা আক্রমণাত্মক প্রচার চালিয়ে এবং ঘৃণার বিষোদগার করেও তাঁকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। সমীক্ষা বলছে, প্রান্তিক অংশের মানুষ, অভিবাসী, তরুণ প্রজন্ম ও অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীরা মামদানিকে সব থেকে বেশি সমর্থন করেছেন। ভোটে প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়েছেন ভারতীয় ও দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীরা। এছাড়াও কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিন ও পূর্ব এশীয় ভোটাররা মামদানিকে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছেন। এই জয় হলো বিভাজন ও ঘৃণার বিরুদ্ধে ঐক্যের জয়। আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর নিউ ইয়র্কের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অতি দক্ষিণপন্থী নীতির বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন যেটা বিশ্লেষকদের মতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে এটা হচ্ছে ইতিহাসের মোড় ঘোরানোর মতো একটা ঘটনা।

"ইতিহাসে কখনও কখনও এমনই বিরল মুহূর্ত আসে, যখন আমরা পুরানো থেকে নতুনের দিকে পা বাড়াই, এক যুগের অবসান ঘটে, যখন বহুদিন ধরে পড়ে থাকা এক জাতির অন্তরাত্মা নিজের ভাষ্য খুঁজে পায়!" জওহরলাল নেহরুর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের কালজয়ী বক্তৃতার এই উদ্ধৃতি দিয়েই ৪ আগস্ট রাতে মামদানি তাঁর ঐতিহাসিক জয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, "আজ রাতে, সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা সফল হয়েছি। ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতের মুঠোয়! প্রভাবশালীদের আজ আমরা ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিয়েছি। নিউ ইয়র্ক আজ রাতে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে। এক নতুন ধরনের রাজনীতির পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। এই শহরকে খেটে খাওয়া মানুষের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

দিল্লীতে বিস্ফোরণ, দেশের সরকারের সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতা

সুমন কান্তি নাগ

ফের জঙ্গী হানা, এবারে দেশের রাজধানী দিল্লীর এক কর্মব্যস্ত দিনে কর্মচঞ্চল রাস্তার বুকে। পহেলগাঁও জঙ্গী হানার সাত মাসের মাথায় আবার দুঃস্বপ্ন তাড়া করল দেশের সাধারণ নাগরিকদের। পুলিশ সূত্রে খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা, পেশায় চিকিৎসক উমর মহম্মদ একটি i20 গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ওই গাড়িতেই বিস্ফোরক ছিল বলে দাবি প্রশাসনের। ১০ নভেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের সামনে একটি সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা ওই গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। সরকারী হিসাবে মারা গিয়েছেন ১০ জন মানুষ, হতাহত আরও অনেক। কিন্তু বেসরকারী হিসাবে মারা গিয়েছেন এর থেকেও অনেক বেশি। সূত্রের খবর, দিল্লী বিস্ফোরণের পরেই তদন্তভার এন আই এ-কে দেওয়া হয়। দেশের রাজধানী দিল্লীর প্রাণকেন্দ্রে কাপুরুষোচিত বোমা হামলার তীব্র নিন্দা করছে সংগঠন, একইসাথে এই বিস্ফোরণে যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, সংগঠন তাঁদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছে।

বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, দিল্লীর আশেপাশের এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, যেগুলিকে এখন এই হামলার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই ঘটনা একটি সংগঠিত চক্রের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়। এই চক্রটিকে খুঁজে বের করা এবং সমস্ত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা সরকারের দায়িত্ব।

দিল্লী বিস্ফোরণ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত চিকিৎসক মুজ্জামিল শাকিল গণাইয়ের ফরিদাবাদের ভাড়া বাড়ি থেকে আটা কল, গ্রাইন্ডার সহ বিস্ফোরক তৈরীর যন্ত্রপাতি উদ্ধার হয়েছে। এমনটাই খবর এন ডি টিভি-র সূত্রে। 'টেরর ডক্টর'-এর বাড়িতে আটা কলের হদিশ (সৌজন্যে টুইটার)। মিডিয়ার হাতে হাতে আসা একাধিক ছবিতে দেখা গিয়েছে, আটা কল, গ্রাইন্ডার এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে হরিয়ানার ফরিদাবাদের এক ট্যাক্সি চালকের বাড়িতে। জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা মুজ্জামিল শাকিল গণাই পেশায় চিকিৎসক। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। লালকেল্লার কাছে ১০ নভেম্বরের গাড়ি বিস্ফোরণে অন্যতম ভূমিকা ছিল তার। ইতিমধ্যে ওই চিকিৎককে গ্রেফতার করেছে এন আই এ। এন ডি টিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফরিদাবাদের ভাড়া বাড়িতে ওই আটা কল ব্যবহার করেছিল গণাই। যেখান থেকে বিস্ফোরণের আগের দিন, ৯ নভেম্বর, উদ্ধার হয়েছিল ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও আরও বিস্ফোরক সামগ্রী। সূত্রের খবর, তদন্তকারীদের জেরার মুখে ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক গণাই স্বীকার করেছে, ওই আটা কলেই ইউরিয়া ঘষে সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত করে ইলেকট্রিক মেশিনে তা আলাদা করত সে। দীর্ঘদিন ধরে এইভাবেই বিস্ফোরক মজুত করছিল সে।

সূত্রের খবর, ট্যাক্সি চালকের বাড়িতে থেকে গণাই আটা কল, গ্রাইন্ডার এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলি নিজের ভাড়াবাড়িতে নিয়ে যায়। প্রথমে ওই ট্যাক্সি চালককে বলা হয়েছিল, বোনের বিয়েতে উপহার দেবে এই যন্ত্রপাতি। পরে সেগুলি বোমা তৈরীর কাজে ব্যবহার করতে নিজের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে যায় গণাই। ইতিমধ্যে দিল্লী বিস্ফোরণের ঘটনায় ওই ট্যাক্সি চালককে আটক করেছে এন আই এ। সূত্রের খবর, ওই চালক তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, চার বছর আগে ছেলের চিকিৎসার জন্য আল ফালাহ মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় গণাইয়ের সঙ্গে। গণাই ছাড়াও আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দু'জন চিকিৎসক লখনউয়ের শাহিন সইদ এবং আনন্তনাগের আদিল আহমেদ রাথরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিল্লীর বিস্ফোরণকারী আত্মঘাতী হামলাকারী উমর উন নবির সঙ্গেও আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ ছিল। হরিয়ানার ধৌজ গ্রামের এক বাড়ি থেকে ৩৫৮ কেজি বিস্ফোরক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করেছে পুলিশ, এছাড়াও বিস্ফোরক তৈরীতে ব্যবহৃত ২৫০ কেজি কাঁচা মাল রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে ওই বাড়ি থেকে। এখন প্রশ্ন হল, এই বিশাল পরিমাণ বিস্ফোরক বা কাঁচামাল কাশ্মীর থেকে হরিয়ানা হয়ে দিল্লীতে পৌঁছালো অথচ উভয় ক্ষেত্রেই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে খবর থাকলো না, এটা বিশ্বাসযোগ্য?

বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ জানায়, 'জঙ্গি কার্যকলাপে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রমাণ থাকলেই জামিন নয়, জেলে পচতে হবে।' শুনানির শুরুতে অভিযুক্তের আইনজীবী বলেন, 'আজকের সকালটা বোধহয় এই মামলার জন্য ঠিক নয়। বিশেষ করে গতকাল দিল্লিতে যা ঘটেছে।' এর জবাবে বেঞ্চ স্পষ্ট মন্তব্য করে, 'ঠিক এই সময়টাই সঠিক— একটা কড়া বার্তা দেওয়ার এটাই সুযোগ।'

সূত্রের খবর, গোয়েন্দাদের কাছে এই ধরনের জঙ্গী হানার ইনপুট আগে থাকতেই ছিল। যেমন বিস্ফোরক সংগৃহীত হচ্ছে, দিল্লীর বুকে তা মজুত করা হচ্ছে এই সমস্ত খবরই পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সেই সতর্কতা প্রশাসনের মধ্যে দেখা যায়নি। উরি, পাঠানকোট, পুলওয়ামা, পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলার সময়েও এই গোয়েন্দা ব্যর্থতা নজরে এসেছিল আমাদের।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে, তাও মনে করিয়ে দেওয়া হয় প্রতিনিয়ত। একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে একদিকে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ভাঙার মতো সেনা হানার ঘটনার মাধ্যমে তাকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তেমনি একই সাথে নিজেদের প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা ঢাকতে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে দেশের বিশেষ এক সম্প্রদায়ের উপর ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রক্রিয়া অব্যহত রাখছে দেশের শাসক দল। পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হানার পরে 'অপারেশন সিঁদুর'-কে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল সমর্থন করেছিল। সরকার বলেছিল পাকিস্তানের সব জঙ্গী ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। যা দেশের জনগণ শুনেছে, একই সাথে দেশের জনগণ দেখেছে কেন্দ্রের শাসকদল দেশ জুড়ে ব্যাপক যুদ্ধোন্মাদনা তৈরী করে হঠাৎই এই অপারেশনে দাঁড়ি টেনেছিল। এখন প্রশ্ন হলো এই গিমিকের রাজনীতি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সফল হয়েছে এ কথা বলা যাবে কি? বরং ২০১৪ সালের পরে সমগ্র দেশ জুড়ে সন্ত্রাসী হানা এখন ক্রমবর্ধমান, 'অপারেশন সিঁদুর' বা 'অপারেশন মহাদেব' করেও দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদের জাল ছিন্ন করতে কেন্দ্রীয় সরকার সফল হয়নি। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

বেঙ্গল ফাইলস ঃ কিছু কথা

ফলে দাঙ্গার কথা আর মনেই থাকেনি। আরও একটা ব্যাপার সেখানে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সুরাওর্দি প্রায় জাতীয় নায়কের মর্যাদা পেতেন। স্বয়ং মুজিবর অবধি তাঁকেই গুরু মানতেন। ফলে ভারতে তাঁর কী ভূমিকা ছিল এক সময়ে, তাই নিয়ে আর কেউ মুখ খোলার চেষ্টাও করেনি। ফলে সেখানেও কলকাতার দাঙ্গা মাটির তলাতেই চলে গিয়েছিল।

তাহলে সেই মাটির তলায় চলে যাওয়া ঘটনাকে এতদিন পরে আবার খুঁচিয়ে তুললেন কেন বিবেক? বিবেক যে সংগঠনের ভাবশিষ্য, সেই আর এস এস-এর তো কোনও ভূমিকাই ছিল না কলকাতার দাঙ্গায়! ভূমিকা থাকার কোনো কথাও ছিল না, কারণ বাংলায় তখন অনুবীক্ষণ দিয়েও আর এস এস-কে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাহলে কেন এই উদ্যোগ? এই প্রশ্নের জবাব পেতে গেলে সেই সময়কার বাংলায় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ ছাড়াও উপস্থিত তৃতীয় আরও একটি দলের কথা বলতে হয়— 'হিন্দু মহাসভা', যার নেতা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

বাংলায় হিন্দু মহাসভা আসলে মদন মোহন মালব্য প্রতিষ্ঠিত 'অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার'-ই (প্রতিষ্ঠা ১৯১৫) অংশ। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের বাংলায় হিন্দু মহাসভার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এমনকি একটা সময়ে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীসভাতেও ছিল এই হিন্দু মহাসভা। ইতিহাস বলছে, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় মুসলিম নিধনে কংগ্রেসের সাথে সাথে হিন্দু মহাসভা এবং তার জাতভাই 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'র সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আর এস এস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে। আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা কে বি হেগড়েওয়ারের ওপর মদন মোহন মালব্য তথা মহাসভার প্রভাব ছিল সাঙ্ঘাতিক। আর এস এসের দর্শন যে 'হিন্দুত্ব', সেই 'হিন্দুত্ব' শব্দটিও মহাসভার আর এক নেতা দামোদর বিনায়ক সাভারকারের আবিষ্কার। যে নাথুরাম গড্‌সে ১৯৪৮ সালে গান্ধিজীকে হত্যা করে, সেই নাথুরাম ছিল একাধারে মহাসভার নেতা এবং সংঘের বিশিষ্ট সদস্য। উভয় দলেরই নেতা ছিলেন, এমন একাধিক ব্যক্তির নাম এখন বলে দেওয়া যায়। পরবর্তীকালে প্রথমে জনসংঘ এবং পরে ভারতীয় জনতা পার্টির কবলে মহাসভা চলে যায় এবং এখন তার অস্তিত্ব নাম মাত্র। সুতরাং মহাসভা, আর এস এস এবং বিজেপি যে একাকার— এ কথাটা আর আলাদা করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বাংলায় মহাসভা এবং মহাসভার কাজ তাই বিবেকের কাছে আপন। 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-ও তাই আপন বিবেকের কাছে।

কিন্তু আপন হলেই কি সেটা কবর খুঁড়ে বের করে আনতে হবে? হবে, তার কারণ 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর সময়ে এখানে আর এস এসের অস্তিত্ব না থাকলেও পরবর্তীকালে একে হাতিয়ার করে আর এস এস সারা ভারতে দ্রুত তার সংগঠন বাড়াতে থাকে। দ্রুত বাড়তে থাকে তার সদস্য সংখ্যা। ''মুসলমানদের কাছ থেকে হিন্দুদের বাঁচাতে গেলে (যেমন কলকাতায় করা গেছে) আর এস এস-ই যে একমাত্র ভরসা''— এ কথা তারা প্রচার করতে থাকে এবং হিন্দুরা সেটা বিশ্বাসও করতে থাকে। এক কথায় কলকাতার দাঙ্গা আর এস এস-এর সামনে সংগঠন বাড়ানোর সুযোগ এনে দিয়েছিল, যে সুযোগ তারা আগে পায়নি। বাংলায় মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদকে তারা ভক্তি করে এই কারণেই।

বাংলায় আম জনতার কাছে আর এস এস তথা বিজেপি বরাবরই ব্রাত্য থেকে গিয়েছে। তৃণমূলের হাত ধরে সম্প্রতি কিছু বিধানসভা আসনে তারা জিতলেও এখানে সরকার গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় আসন সংগ্রহে তারা বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ করেছেন বাংলারই মানুষ। আজ বাংলায় তৃণমূলের অপদার্থতা এবং মূলত নিজেদের ক্রমবর্ধমান দুষ্কর্মের শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্যে বিজেপির সাথে তাদের সেটিং ফের বিজেপিকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে এখানে সরকার গড়ার। সেই কারণেই বাঙালি সেন্টিমেন্টকে খুঁচিয়ে তোলার জন্যে ফের মহাসভার গুণকীর্তন, ফের কবর খুঁড়ে দাঙ্গার ঘটনাকে তুলে আনা। এধরনের কাজ বিবেক আগেও করেছেন এবং এবার ফের সেটাই করলেন।

লেখাটা এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বিবেক তাঁর সিনেমায় জনৈক 'গোপাল পাঁঠা'-কে প্রায় ভগবানের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এই গোপালের সম্পর্কে কিছু না বললে ক্ষমতার লোভে বিবেক বা তাঁর গুরুভাইয়েরা কতটা নীচে নামতে পারেন, বোঝানো যাবে না। ১৯১৩ সালে কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন গোপাল চন্দ্র মুখার্জী ওরফে গোপাল পাঁঠা (তাঁদের পারিবারিক মাংসের দোকান ছিল বলেই এই নাম)। সম্পর্কে ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র মুখার্জীর ভাইপো। এহেন মহান মানুষের ভাইপোটির নাম প্রায় কিশোর বয়েস থেকেই পুলিশের খাতায় 'ক্রিমিনাল' হিসেবে নথিভুক্ত ছিল, যদিও নিজেকে তিনি 'কংগ্রেস কর্মী' হিসেবেই পরিচয় দিতেন। এই গোপালের আবার বিভিন্ন ক্লাব থেকে যোগাড় করা প্রায় ৪০০ ছেলেকে নিয়ে এক বাহিনী ছিল, যারা তাকে তার 'কাজে' সাহায্য করত। ব্যবসার কারণে গোপালের সাথে বহু মুসলিমের যোগাযোগ ছিল এবং কখনোই তাদের প্রতি কোনও বিরূপ মনোভাব তার ছিল না। '৪৬-এর ১৬ আগস্ট এহেন গোপালের মনে হঠাৎ করেই হিন্দু প্রেম জেগে ওঠে এবং সে তার বাহিনীকে নিয়ে নেমে পড়ে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'। নির্বিচারে চালাতে থাকে খুন। একই রকম ভাবে লীগের পক্ষেও (আসলে মুসলমানদের পক্ষে) এক জন গুণ্ডা ওই একই ভাবে নেমে পড়েছিল, যার নাম ছিল শেখ হাবু বা 'হাবু গুণ্ডা'। কংগ্রেস যেমন কোনও দিন গোপালকে স্বীকৃতি দেয়নি, লীগও তেমনি হাবুকে কোনও দিন স্বীকৃতি দেয়নি। যাই হোক, হাবুও একই কাজ, অর্থাৎ নির্বিচারে হত্যা শুরু করে দিয়েছিল। অর্থাৎ এদিক দিয়ে গোপাল এবং হাবুর মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। ১৭ আগস্ট হাবুর মুণ্ডহীন দেহ গ্রে স্ট্রীটে পাওয়া যায়। মুসলমান দুষ্কৃতিরা তাকে সেদিন বীরের সম্মান দিয়েছিল। আজ বিবেক গোপালকে বীরের সম্মান দিচ্ছেন। এটাই বিবেক। এটাই বিজেপি। এদের হাতে বাংলাকে কোনও দিন ছাড়া যাবে না। কোর্টের আদেশে শেষ পর্যন্ত 'বেঙ্গল ফাইলস' মুক্তি পেয়েছিল বটে, কিন্তু বাংলার দর্শক তাকে বাতিল করে দিয়েছেন। একই রকম ভাবে বাতিল করার দরকার বিজেপিকেও এবং তার সাজানো শত্রু, আসলে বন্ধু রাজ্যের বর্তমান শাসক দলকেও। তাহলেই ভবিষ্যত বাংলার আনন্দ, ভবিষ্যত প্রজন্মের মুক্তি। □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র হিসাবে জোহরান মামদানির জয় ঃ একটি বিশ্লেষণ

বাসযোগ্য করে তোলার পক্ষে সরব হয়েছে!"

ভোটের প্রচারে প্রথম থেকেই গাজায় গণহত্যার জন্য ইজরায়েলের তীব্র সমালোচনা করেন মামদানি। তিনি বলেন, তিনি যদি মেয়র নির্বাচিত হন, তাহলে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের ফরমান মেনে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানেয়াহু নিউ ইয়র্কে ঢুকলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁর এই অবস্থানের জন্য বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম প্রচার করে যে নিউ ইয়র্কের ১৯ লক্ষ ইহুদী অধিবাসীরা তাঁকে ভোট দেবেন না। দক্ষিণপন্থীরা তাঁকে 'ইহুদী বিদ্বেষী' বলে দাগিয়ে দেয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে প্রায় ৬০ শতাংশ ইহুদী অধিবাসী মামদানির পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং তাঁদের একটা বড় অংশ সক্রিয়ভাবে তাঁর পক্ষে প্রচারও করেছেন।

এযুগের বিশ্ব পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্যের কেন্দ্র হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মামদানির জয়ের ফলে অতি কেন্দ্রীভূত মার্কিন পুঁজির একনিষ্ঠ প্রহরী অতি দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প 'কমিউনিজমের ভূত' দেখতে শুরু করেছেন। সেই আতঙ্কে তিনি আজ রীতিমতো দিশাহারা। তবে কথায় আছে না 'নাচতে না জানলে উঠোন বেঁকা'। ভোটে হেরে গিয়ে নানা অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করছেন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ও তাঁর সহযোগীরা। ট্রাম্প ভোট ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছেন। এলন মাস্ক নিউ ইয়র্কের ভোট প্রক্রিয়াকেই জালিয়াতি বলে ঘোষণা করেছেন। তবে তাঁদের আজগুবি অভিযোগকে কেউ তেমন আমল দেয়নি। মামদানির জয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে সাধারণ মানুষ। ৪ আগস্ট শীতের রাতেও ওয়াল স্ট্রীট ছিল তাঁদের দখলে। স্টক এক্সচেঞ্জের উল্টো ফুটেই এক ঝলমলে পোস্টারে লেখা, 'সোশ্যালিজম ইজ দ্য ফিউচার!' আমেরিকার সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহর, বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্রে এমন আচমকা পরিবর্তন চমকে দিয়েছে গোটা দুনিয়াকে।

এই প্রথম আমেরিকার কোনও বড় নির্বাচনে একজন বামপন্থী প্রার্থী জিতলেন। সেদেশের রাজনীতিতে এই ঘটনার এক দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত আমেরিকার রাজনীতি দক্ষিণপন্থা ও মধ্যপন্থার বাইনারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্লেষকদের মতে বামপন্থী প্রার্থী মামদানির জয়ের ফলে সেই চিরাচরিত বাইনারি ভেঙে গেছে। পরবর্তীকালে আমেরিকায় বামপন্থার উত্থান দেখা যাবে বলে অনেকে মনে করছেন। দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে হবে এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত অংশের মানুষের জন্য আরও বহুমুখী সামাজিক সুরক্ষা প্রয়োজন; বামপন্থী প্রার্থী মামদানির এই প্রতিশ্রুতিই খেটে খাওয়া মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। গত কয়েক মাস ধরে মামদানির হয়ে সক্রিয়ভাবে প্রচার করেছেন আমেরিকার বামপন্থী সেনেটর বার্নি স্যান্ডার্স। তিনি বলেছেন, ''জোহরান মামদানি আমেরিকার আধুনিক ইতিহাসে অন্যতম প্রধান এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের নায়ক! হ্যাঁ, আমরা পারি। আমরা পারি এমন এক সরকার তৈরী করতে যা খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবে, সমাজের শীর্ষে থাকা এক শতাংশের নয়।''

৪ আগস্ট নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের পাশাপাশি আমেরিকার নিউ জার্সি ও ভার্জিনিয়া প্রদেশে গভর্নর পদেও নির্বাচন হয়েছিল। সব জায়গাতেই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন। আমেরিকার ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে— ২০২৫ সালের নির্বাচনে দু'জন কমিউনিস্ট পার্টি ইউএসএ (CPUSA)-এর প্রার্থী স্থানীয় নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। হান্না শভেটস (Ithaca, নিউ ইয়র্ক) ও ড্যানিয়েল কারসন (Bangor, মেইন) সিটি কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। দু'জনেই সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, এবং তাঁদের এই জয় আমেরিকায় কমিউনিস্টদের জন্য প্রায় ৮০ বছরের মধ্যে প্রথম জয়।

সর্বশেষ এমন ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪০-এর দশকে, যখন পিটার ক্যাচিওনি ও বেন ডেভিস জুনিয়র নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসাবে।

মামদানি একজন ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট— তিনি বাম রাজনীতির পরিচিত মুখ হলেও সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নন। তাই নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র হিসাবে মামদানি নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি, শভেটস ও কারসনের এই জয় অনেক গভীর প্রতীকী অর্থ বহন করে; এটি মার্কিন কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন জাগরণ।

পশ্চিম গোলার্ধে, এই মরা সময়ে হঠাৎ বামদিকে মোড় নিল ইতিহাস! □

জে এন ইউ ফিরে পেল ঐতিহ্য

আশিস মিত্র

এ বিভিপি-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘৃণ্য আঁতাতের সমস্ত রকমের অপচেষ্টাকে দুরমুশ করে দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের চার কেন্দ্রীয় পদে জিতেছে বামছাত্র ঐক্য। একই সাথে পন্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ক্যাম্পাসে বিপুল ভোটে জিতেছে এস এফ আই। হাজার অপকৌশল অবলম্বন করেও দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁত ফোটাতে পারেনি এবিভিপি।

বামপন্থীরাই যে ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র ভরসার জায়গা এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে তারাই যে জেতে, একথা আবারও প্রমাণ হল।

গত ৪ নভেম্বর, ২০২৫ জে এন ইউ-এ ভোট গ্রহণ হয়। মোট ৯০৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৬৭ শতাংশ ভোট দেন। গণনার শুরু থেকে বামছাত্র ঐক্য এস এফ আই, আইসা ও ডি এস এফ প্রার্থীরা এগিয়ে থাকেন। ৬ নভেম্বর, ২০২৫ রাতে ভোটের ফল প্রকাশ হয়। সভাপতি পদে জিতেছেন আইসার অদিতি মিশ্র, সহ সভাপতি পদে এস এফ আই-র গোপিকা বাবু, সাধারণ সম্পাদক পদে ডি এস এফ-র সুনীল যাদব এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে জিতেছেন আইসার দানিশ আলি। সব পদেই বড় ব্যবধানে হেরেছে এবিভিপি।

গত বছর এস এফ আই ও আইসা আলাদা ভাবে লড়ায় বামপন্থীদের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হয়। বাকি সমস্ত পদে বামপন্থীরা জিতলেও যুগ্ম সম্পাদক পদে জেতে এবিভিপি। গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে একসাথে লড়ার সিদ্ধান্ত নেয় এস এফ আই এবং আইসা। যথারীতি যুগ্ম সম্পাদক পদ এবার বামপন্থীরা পুনরুদ্ধার করেছে।

চার কেন্দ্রীয় পদের মধ্যে সব থেকে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন সহ-সভাপতি পদে বামছাত্র ঐক্যের প্রার্থী এবং এস এফ আই নেত্রী গোপিকা বাবু। এবিভিপি প্রার্থীকে তিনি ১২৩৬ ভোটে পরাজিত করেছেন।

চার কেন্দ্রীয় পদের পাশাপাশি জেএনইউ-র বিভাগীয় কাউন্সিলর ও অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি (আইসিসি) নির্বাচনে এবিভিপি কার্যত সাফ হয়ে গিয়েছে। বহু বছর পর এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য বিভাগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, চারুকলা ও নন্দনতত্ত্ব বিভাগ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ, আইন বিভাগ, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ও মলিকিউলার মেডিসিন বিভাগ 'এবিভিপি' মুক্ত হয়েছে। এই ৯টি বিভাগে একটিও কাউন্সিলর জিততে পারেনি আর এস এস-র ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। আইসিসি-র তিন প্রতিনিধি পদেও প্রগতিশীল সংগঠনগুলির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় এই ৯টি বিভাগে বিগত দিনে বামপন্থীরা তুলনায় দুর্বল ছিল।

সামগ্রিক এই জয় হল প্রগতিশীল সমবেত ঐক্যের জয়।

জে এন ইউ-র এই জয়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন এস এফ আই-র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি। তাঁরা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, এই জয় নিছক এক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়। এটি এক স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা। ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অবস্থান রেখেছেন জে এন ইউ-র পড়ুয়ারা। এই ফলাফল প্রমাণ করে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ বহুত্ববাদ, সামাজিক ন্যায় এবং প্রগতিশীল রাজনীতির মূল্যবোধকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় পদ ও বিভাগীয় কাউন্সিলর পদে বামছাত্র ঐক্যের জয় ঐক্যবদ্ধতা ও ইস্যুভিত্তিক রাজনীতির শক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা দক্ষিণপন্থী বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। □

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গেয়েই মৌলবাদী ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল কর্মচারী সমাজ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে সারা রাজ্যজুড়ে দপ্তরে দপ্তরে রবীন্দ্র সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা" গেয়ে রবীন্দ্র ভাবনার উপর মৌলবাদী আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদে শামিল হলো রাজ্যের কর্মচারী সমাজ। কলকাতার অঞ্চলগুলি সহ রাজ্যের সর্বত্র টিফিন বিরতিতে এই প্রতিবাদ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গান আসামে গাওয়া চলবে না বলে ফতোয়া জারি করেছে আর এস এস পরিচালিত আসামের রাজ্য সরকার। এই গান গাওয়ায় সম্প্রতি আসামে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করার কথা ঘোষণা করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। এই আচরণকে ধিক্কার জানিয়ে এরাজ্যের সর্বত্র শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একযোগে প্রতিবাদে শামিল হন। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি জগতের মানুষের সাথে প্রতিবাদে শামিল হন ছাত্র, যুব সহ বিভিন্ন গণ সংগঠন, প্রতিবাদে শামিল হন অধ্যাপক, শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিবাদে শামিল হন রাজ্যের কর্মচারী সমাজ। রবীন্দ্রগানেই রবীন্দ্র চেতনার উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন মানুষ। রাজ্যজুড়ে উদাত্তকণ্ঠে গাওয়া হয় "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি"। রবীন্দ্র চেতনার উপর সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী আক্রমণের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে সরকারী দপ্তরের অভ্যন্তরে। প্রতিবাদী মানুষ স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বা রচনা কোনও দেশ-কালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। ফতোয়া জারি করে নিষিদ্ধ করা যায় না।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে যে সভা হয়, সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি রচনা করেন। আজ আর এস এস মতাদর্শে পরিচালিত আসামের মুখ্যমন্ত্রী এই গান পরিবেশন করাকে দেশদ্রোহী কাজ বলে চিহ্নিত করছেন। আমাদের রাজ্যের ওই একই রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতাও এর সমর্থনে দাঁড়িয়ে মিডিয়ায় যোষণা করছেন যে ক্ষমতায় এলে এরাজ্যেও এই গান গাওয়া নিষিদ্ধ করা হবে। অথচ এই একই দলের সদস্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জনসভায় "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" বলেই বক্তৃতা শুরু করেছিলেন।

লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগ বিল এনেছিলেন ১৯০৩ সালে। এর প্রতিবাদে ১৯০৪ সালে মে মাসে বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ "বঙ্গ বিভাগ" প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের আবহে রবীন্দ্রনাথ একের পর এক কবিতা, গান রচনা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমের এই গানগুলিতে কোনও উগ্র জাতীয়তাবাদ নেই, পরধর্ম বিদ্বেষ নেই, সাম্প্রদায়িকতা নেই। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট টাউন হলের সভা উপলক্ষে যে গান রচিত হয়েছিল, সেই "আমার সোনার বাংলা" গাইতে গাইতে হাজার হাজার মানুষ সেদিন পথে হেঁটেছিলেন। জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে মানুষ এক হয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। এর ছ'বছর পর ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশ এই গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৭২ সালে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ, এমনকি জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকারের উপরেও নজরদারি, বাধানিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এবার আক্রমণ সরাসরি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার উপর। আসামের বাঙালি অধ্যুষিত করিমগঞ্জ জেলায় কংগ্রেস সেবাদলের একটি অনুষ্ঠানে একজন কর্মী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলার সময় "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটি খালি গলায় পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে শুরুতে বন্দেমাতরম এবং শেষে ভারতের জাতীয় সংগীতও পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু বিভেদকামীদের তরফে শুধুমাত্র "আমার সোনার বাংলা" গানটি সমাজমাধ্যমে প্রচার করে অভিযোগ করা হয় যে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সরব হন। এরা ভুলিয়ে দিতে চাইছে এই গানটির প্রেক্ষাপট। যে গান কবিগুরু বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন, সেই গানের একটি অংশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করে। এরপর হয়তো বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বলে এদেশে বাংলা ভাষায় কথা বলার উপরেও আক্রমণ নেমে আসবে। সম্প্রতি বেশ কিছু রাজ্যে এরাজ্যের বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণের ঘটনাও সামনে এসেছে। একদিন পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়েছিল "আমার সোনার বাংলা", এবার ভারতের একটি রাজ্যেও একই চিত্র। এটাই প্রমাণ করে মৌলবাদের কোনও ধর্ম বা মাতৃভূমি নেই।

শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষ নয়, সারা দেশ জুড়ে এই ঘৃণ্য ঘটনার তীব্র প্রতিবাদে শামিল হতে হবে সকল সভ্য মানুষদের। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি, নজরুলের সংস্কৃতি যারা মুছে ফেলতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংগ্রাম চলছে, চলবে। □

দীপঙ্কর বাগচী

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

স্বাস্থ্য দপ্তরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মসূচী

স্বাস্থ্য ভবন সংলগ্ন এলাকায় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মানস দাস। স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে পেশ করা স্মারকলিপির বিষয়বস্তু উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম-সম্পাদক দেবব্রত রায়। ধুঁকতে থাকা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি নিয়েও যে নিরলস ভূমিকা পালন করছেন তা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কর্মচারী ও পেনশনাররা এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। □

—আশিস মিত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ১১৬/২৫ তারিখ ঃ ০৮/১২/২০২৫

প্রতি,
স্বাস্থ্য অধিকর্তা
স্বাস্থ্য দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাশয়,

ইতিপূর্বে স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্যাবলি নিয়ে আপনার সাথে আলোচনার জন্য একাধিকবার পত্র দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আলোচনার সময় নির্ধারিত হয়নি। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। ফলে তাদের পক্ষে রোগীদের পরিষেবা দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মচারীরা নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। এই বিষয়গুলি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে যাতে এইসব সমস্যা দূরীকরণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি। বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীরা যেসব সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে তা নিচে লিখিত আকারে জানানো হচ্ছে।

১। স্বাস্থ্য পরিষেবা জনমুখী করতে সর্বস্তরের শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে।

২। সর্বস্তরের কর্মচারীদের গ্রেডেশন তালিকা দ্রুত ও নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

৩। এম. টি, প্যারামেডিকেল কর্মচারীদের in service training-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলোতে ১০ ঃ ১ অনুপাতে হেড ক্লার্কের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৫। Administrative Office (AO)-এর পদ নতুন করে তৈরি করা সহ ডাইরেক্টরেট ও রিজিওনাল স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে সমানুপাতিক হারে পদোন্নতি দিতে হবে।

৬। সুনির্দিষ্ট বদলি নীতি চালু করা সহ হয়রানি মূলক বদলি বন্ধ করতে হবে।

৭। নার্সিং কর্মচারীদের ক্ষেত্রে Preventive এবং Curative এর দুই ক্ষেত্রেই বিপুল শূন্যপদ পড়ে আছে। অবিলম্বে তা পূরণ করতে হবে। উপরের দুটি ক্ষেত্রেই পদোন্নতির তীব্র সমস্যা আছে। অবিলম্বে সুষ্ঠ পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। সাব-সেন্টার গুলিতে NQAS Visit-কে কেন্দ্র করে যে খরচ হয় তা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় untied Fund-এর টাকা সাব-সেন্টারগুলি পাচ্ছে না। অবিলম্বে সাব-সেন্টারগুলিতে untied Fund-এর টাকা বরাদ্দ হবে।

৯। ANM-রা সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি পেলেও তাদের এ. এন. এম-এর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। অবিলম্বে এ. এন. এম-দের এই দ্বৈত দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। ANM-দের ক্যাডার ভুক্ত করতে হবে।

১০। আশাকর্মী এবং দাইয়েরা সঠিক সময়ে ন্যায্য প্রাপ্য পাচ্ছে না। অবিলম্বে তাদের বকেয়া অর্থ প্রদান করতে হবে।

১১। অধিকাংশ সাব-সেন্টার পরিচালনার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। সাব-সেন্টার গুলিতে এন. এম. টি.এ-এর কর্মী স্বল্পতা। এই সমস্ত অব্যবস্থা অবিলম্বে দূর করতে হবে।

১২। সিস্টার-ইন-চার্জ পদে পদোন্নতির জন্য যে তিনটি ফিডার পোস্ট আছে, সেখান থেকে পদোন্নতি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট অনুপাত নেই। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুপাতে ফিডার পোস্ট থেকে পদোন্নতি হয় আধিকারিকদের মর্জি-মাফিক। অবিলম্বে পদোন্নতির ক্ষেত্রে তিনটি ফিডার পোস্ট থেকে নির্দিষ্ট অনুপাতে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। NCD Clinic-গুলিতে কর্মচারীর অভাবে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। অবিলম্বে সেখানে কর্মচারীর যুক্ত করতে হবে।

১৪। রোগী কল্যাণ সহায়কদের কাজের দায়িত্বের মানদণ্ড সঠিকভাবে বিচার করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকছে। এই দুর্বলতা অবিলম্বে দূর করতে হবে।

১৫। ভিন্ন রাজ্য থেকে সার্টিফিকেট কোর্স করে জি. এন. এম-এর পদে নিযুক্ত হচ্ছে যারা, তাঁরা উপযুক্ত পরিষেবা দিতে পারছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে নিয়োগে কোনো অস্বচ্ছতা থাকলে অবিলম্বে তা দূর করতে হবে।

১৬। বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীদের ওপর একাধিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে। এর অত্যন্ত সাম্প্রতিক নিদর্শন আমতা হাসপাতালে নার্সকে নিগ্রহের ঘটনা। জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। সমস্ত হাসপাতালে কর্মীদের নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।

১৭। চন্দ্রবোড়া সাপের এন্টি-ভেনাস কাজ করছে না বলে প্রচুর মানুষ চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিতে উন্নতমানের চন্দ্রবোড়া সাপের এন্টি-ভেনাস সরবরাহ করতে হবে।

১৮। সি. এইচ. ও-দের অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের কাজের বাইরে প্রায় ডাক্তারদের সমান ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। সি. এইচ. ও-রা যাতে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কাজটিই করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯। গ্রামীণ এলাকার যে সব এ. এন. এম / সি. এইচ. ও-রা কাজ করছেন তাদের বিভিন্ন তথ্য অনলাইনে আপডেট করতে হচ্ছে নিজেদের অর্থ খরচ করে। এদের নেট রিচার্জের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

২০। এজেন্সির গাড়ি যখন লং ডিউটির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে তখন এজেন্সির ড্রাইভারদের বদলে স্থায়ী ড্রাইভারদের ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থায়ী ড্রাইভারদের শুধুমাত্র স্থায়ী গাড়ি চালানোর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

২১। স্বাস্থ্য দপ্তরের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনায় পড়লে কোর্ট কেসের জন্য আইনজীবীদের নিয়োগের খরচ দপ্তরের বদলে ড্রাইভারদের বহন করতে হচ্ছে। এটা বন্ধ করে দপ্তরকে আইনজীবীদের খরচ বহন করতে হবে।

২২। অনেক ক্ষেত্রে ড্রাইভারদের জি.পি.এফ সহ বিভিন্ন লোন অনুমোদন করতে কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করছেন। ড্রাইভারতের লোন দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। মেকানিকদের দিয়ে ক্লিনারের কাজ করানো বন্ধ করতে হবে।

২৩। গ্রুপ-ডি পদের কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ান্তর সার্ভিস বুক আপডেট করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করতে হবে। সরকারী আবাসনে থাকার জন্য মাসে মাসে বেতন থেকে প্রাপ্য বাড়ি ভাড়া কেটে নেওয়া হচ্ছে, অথচ আবাসনগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এই অব্যবস্থাগুলি দ্রুত দূর করতে হবে।

২৪। স্বাস্থ্য দপ্তরে চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের অবিলম্বে স্থায়ী করতে হবে। অস্থায়ী কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি সহ অন্যান্য সুযোগগুলোকে অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে,

ইতি
ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
53rd Year, 6th & 7th Edition, October-November, 2025
Regd. No. : 18484/71

নার্সিং কর্মীদের মিছিল ও সভা

দাবি ঃ সর্বস্তরে মহিলা কর্মচারীদের সুরক্ষা ও শূন্যপদে নিয়োগ

গত ৩ নভেম্বর, ২০২৫ ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে মিছিল ও জমায়েতের মধ্যে দিয়ে তাঁরা সুরক্ষা নিরাপত্তার দাবি জানালেন প্রশাসনের দরবারে। একই সাথে নার্সিং-এর শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ ও অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীপদে নিয়োগ করে হাসপাতালে সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রাখার দাবিতেও সরব হন সংগঠনের সদস্যরা।

ওইদিন মৌলালি থেকে শুরু হয় মিছিল। দাবিদাওয়া সংবলিত শ্লোগান তুলে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, ব্যানার নিয়ে নার্সিং কর্মীরা এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে এগিয়ে পৌঁছান কলকাতা কর্পোরেশন কার্যালয় সংলগ্ন স্থানে। সেইখানে সমাবেশ করেন নার্সিং কর্মীরা। মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ, সংগঠনের সভাপতি মানস দাস, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ্ সার্ভিস ডক্টরসের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগঠনের সভাপতি ডাঃ গৌতম দাস, স্টুডেন্টস হেলথ্ হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী প্রমুখ।

মূলত ৬ দফা দাবি নিয়ে এদিন সোচ্চার হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এসোসিয়েশন। দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যুগ্ম সম্পাদিকা কণিকা দত্ত।

আর জি কর হাসপাতাল সহ রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন হাসপাতালে

ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিনিয়ত যেভাবে নারী নিগ্রহ ও নার্সিং কর্মচারীদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটছে তার নানা উদাহরণ তুলে ধরে সরকার, পুলিশ প্রশাসনের উদাসীনতা ও গাফিলতির তীব্র প্রতিবাদ জানান সভায় উপস্থিত নেতৃত্বরা। তাঁরা বলেন গ্রামবাংলায় বহুক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি নির্জন স্থানে অবস্থিত, সেখানে কখনো কখনো একাই ডিউটি করতে হয় স্বাস্থ্যকর্মীদের, নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকে না। এইভাবেই নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরো জোরালো করতে হবে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা পিকু ব্রহ্ম বলেন, আমাদের দাবি, অবিলম্বে শূন্যপদগুলিতে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ করতে হবে। কর্মীর অভাবে হাসপাতালের পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে চূড়ান্তভাবে। দায়ী করা হচ্ছে চিকিৎসক ও নার্সদের। তিনি দাবি তোলেন সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করতে হবে। সুষ্ঠু বদলি ও পদোন্নতির নীতি গ্রহণ করতে হবে। দিতে হবে ন্যায্য বকেয়া মহার্ঘভাতা, বৃদ্ধি করতে হবে ছাত্রী নার্সদের স্টাইপেন্ড। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে হাসপাতালের পরিকাঠামো বৃদ্ধি ও সাবসেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্য প্রকল্পের সাথে যুক্ত কর্মীদের সাপ্তাহিক ছুটি সুনিশ্চিত করতে হবে।

এই দাবিদাওয়ার মীমাংসা না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এসোসিয়েশন। □

পেনশনার্স সমিতির ডাকে ৮ দফা দাবিতে মুখ্যসচিবের কাছে ডেপুটেশন ও কেন্দ্রীয় সমাবেশ

গত ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির ডাকে ৮ দফা দাবিতে মুখ্যসচিবের কাছে ডেপুটেশন ও রামলীলা পার্কে কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের ২২টি জেলা ও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পেনশনাররা ব্যাপক সংখ্যায় এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। গণসংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে দুপুর ২টোয় এই কর্মসূচী শুরু হয়। পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা।

সমাবেশে দাবিসনদ পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অরুণা ঘোষ। প্রধান দাবিগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪০ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ রিলিফ প্রদান ও এ আই সি পি আই নির্ধারিত মূল্যসূচক মেনে মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ রিলিফ প্রদান, পেনশন সংশোধনী বিল বাতিল, ন্যূনতম ১৩ হাজার টাকা পেনশন, প্রবীণ নাগরিকদের রেল কনসেশন পুনরায় চালু করা, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীমে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্যাসলেসের সুবিধা চালু করা, সরকারী স্বাস্থ্য প্রকল্পে বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হয়রানি বন্ধ করা এবং দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, নারী-নির্যাতন, প্রতিহিংসামূলক গ্রেপ্তারের মতো ঘটনা বন্ধ করা।

দাবি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক সুজিত দাশগুপ্ত। বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক ও অভয়া আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতৃত্ব ডঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য পেনশনার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক অরুণা ঘোষ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীর হাতে চুরাশি হাজার টাকার চেক তুলে দেন। এর আগেও সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সমাবেশে বক্তব্য রাখার জন্য বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীকে আহ্বান জানানো হয়। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে সমাবেশ করতে দেয়নি রাজ্য সরকারের প্রশাসন। কিন্তু আজ রামলীলা পার্কে যে জমায়েত হয়েছে, সেই জমায়েত রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে হলে জায়গার অভাব হয়ে যেত। এই বিপুল সমাবেশ প্রশাসনকে জবাব দিয়ে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন ও লাল সেলাম জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বৈরাচারী রাজ্য সরকারের পাশাপাশি আমরা কেরালার রাজ্য সরকারকেও দেখছি। মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে আজ কেরালা সরকার রোল মডেল হয়ে উঠেছে। তাদের বিকল্প নীতি মানুষকে নতুন দিশা দেখাচ্ছে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সরকারী চাকুরিজীবীরা শাসকের ব্যক্তিগত দাস নন। মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে তাঁরা জীবনের দীর্ঘ সময় জনসাধারণের জন্য কাজ করেন। সেই পরিষেবার বিনিময়ে তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা ও অবসরকালীন আর্থিক প্রাপ্য নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে কেন আলাদা করে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে? বঞ্চনার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আপনারা রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। দীর্ঘ লড়াই-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের শ্রমজীবী মানুষ গণতন্ত্রের অধিকার পেয়েছেন। দেশের সংবিধান আমাদের ব্যক্তিগত খাদ্যাভাস, ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের অধিকার দিয়েছে। সব থেকে বড় বিষয় হল, জনগণের করের টাকাকে মানুষের হিতসাধনে ব্যবহার করাই গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের দায়িত্ব। তার বদলে মন্দির তৈরী করে, পুজো কমিটিকে টাকা দিয়ে তহবিলে টাকা নেই বলে ডিএ, পেনশনের টাকা না দিলে তার বিরুদ্ধে মানুষকে রাস্তায় নামতে হবে। কেবল আদালতের নির্দেশিকায় পরিস্থিতি বদলাবে না, তার সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেরও প্রয়োজন।

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক সুজিত দাশগুপ্ত জানান যে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পেনশনার্স দিবস উপলক্ষে রাজ্য প্রতিনিধিরা দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ও রাজ্যপালের দপ্তরে ১০ দফা দাবির স্মারকলিপি জমা দেবেন। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

সম্মেলন সংবাদ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইতিহাসে কলকাতার অঞ্চলে প্রথম মহিলা সম্পাদক

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২১তম রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে কলকাতা মধ্যাঞ্চলের সম্মেলন গত ২০ ডিসেম্বর খাদ্য ভবনে মধ্যাঞ্চলের দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। গণসঙ্গীত পরিবেশনের পর সম্মেলন পরিচালনার জন্য সুনীল পাল, স্বরূপ মণ্ডল ও শান্তনু চ্যাটার্জীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়।

সম্মেলন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রুবি সিনহা। তিনি তাঁর বক্তব্যে দেশ জুড়ে শ্রমজীবী মানুষের ওপর আক্রমণ, প্রশাসনে দুর্নীতি এবং ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির কথা উল্লেখ করেন। সরকারী কর্মচারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের আর্থিক বঞ্চনা ও প্রশাসনিক আক্রমণের সমালোচনা করেন। রাজ্যের সার্বিক অবনতি, চরম দুর্নীতি এবং কেন্দ্রের স্বৈরাচারী, দেশবিরোধী, জনবিরোধী, ধর্মীয় বিভাজন ও ফ্যাসিবাদী প্রবণতাকে পরাস্ত করতে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অঞ্চলের সহ সম্পাদক দিলীপ কোলে। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন অঞ্চলের কোষাধ্যক্ষ বীরেশ্বর রায়। প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অনিন্দিতা মৌলিক, হাসিবুর রহমান ও দেবাশিস মুখার্জী। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক সুজিত দত্ত। অঞ্চলে আগত প্রতিনিধিরা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনা শেষ হওয়ার পর জবাবী ভাষণ দেন অঞ্চলের সম্পাদক সুব্রত ব্যানার্জী। এছাড়া সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতিকে জয় করতে সরকারী কর্মচারীদের আরও দায়দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রাম-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এরপর আগামী তিন বছরের জন্য নতুন অঞ্চল কমিটি নির্বাচন করা হয়। স্বরূপ মণ্ডল সভাপতি, মহুয়া সাহা সম্পাদক, গৌরাঙ্গ দাস যুগ্ম সম্পাদক ও পিনাকী গোলদার কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলা কলকাতার কোনও অঞ্চলের সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন। □

সরকারী ড্রাইভার্স-মেকানিক্যাল কর্মীদের রাজ্য সম্মেলন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ড্রাইভার্স ও মেকানিক্যাল ওয়াকার্স ইউনিয়নের ২০তম রাজ্য সম্মেলন গত ২০-২১ ডিসেম্বর, ২০২৫ দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি শহরে কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে কমরেড অশোক গাঙ্গুলী নগর, কমরেড সত্য দাস ও কমরেড অবিনাশ ঘোষ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল শহরের পাকুড়তলা মোড় ঘুরে সেবক রোড, হাসমি চক হয়ে কর্মচারী ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিলে ১২ই জুলাই কমিটি, সি আই টি ইউ ও পেনশনার্স সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মিছিলের শেষে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক উত্তম চতুর্বেদী। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক তাপস সরকার, মনোজ নাগ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমিতির ৮০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক উদয় মল্লিক। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ নিরঞ্জন মণ্ডল। পেশাগত দাবিদাওয়া, সর্বনাশা শ্রমকোড বাতিল ও নারী সুরক্ষার দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করেন সমিতির নেতৃবৃন্দ। প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় ও প্রস্তাবনাকে পর্যালোচনা করে বক্তব্য রাখেন ২০ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সম্মেলনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগামী দিনে করণীয় প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সমিতির ইতিহাস নিয়ে বলেন সমিতির জন্মলগ্নের সময়কার উপদেষ্টা ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায় চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন জেলার সি আই টি ইউ নেতা গৌতম ঘোষ ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক অরিন্দম মিত্র। সম্মেলন থেকে তুষার দাসকে সভাপতি, উদয় মল্লিককে সাধারণ সম্পাদক, নিরঞ্জন মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ করে ৪৫ জনের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় আগামী দিনে সংগঠন পরিচালনার জন্য। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। □

—আশিস মিত্র

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।